রবীন্দ্র-নাটক-প্রসঙ্গ

সাহিত্য ভবনঃ কলিকাতা—সাত

স্বর্গত পিতৃদেবের

চরণোদ্দেশে

॥ ভূমিকা ॥

রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে রবীন্দ্র-নাটক-প্রসঙ্গ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হল। ব্যাপকতায় না হলেও ভাবের গভীরতায়, অনির্বচনীয়ের উপস্থাপনায় এবং প্রসাধন-বৈচিত্র্যে রবীন্দ্র-নাটকের শিল্প-সমুৎকর্ষ অসাধারণ। এ সকলের বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রসাহিত্যে পারদর্শী সুধী সমালোচকবৃন্দ এ আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। এই গ্রন্থে আমিও এই সম্পর্কে দুই চারিটি কথা বলতে চেষ্টা করেছি।

সাধারণ পাঠক এবং ছাত্রদের উপযোগী করেই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়েছে। তবু যদি কোন বিদগ্ধ-রসিক-চিত্ত এইগুলির মধ্যে কিছু আনন্দ লাভ করেন তাহলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। প্রবন্ধগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ; অতএব এদের মধ্যে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি চোখে পড়বে। প্রবন্ধের দাবিতেই তা এসেছে। তাই সেগুলি বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

রবীন্দ্রনাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য প্রবন্ধগুলির মধ্যেই বলেছি। ভূমিকায় মাত্র দুটি-একটি কথার অবতারণা করতে চাই। নাটকের চিরাচরিত কাঠামোটিকে তিনি সর্বত্র স্বীকার করেন নি। নানা নূতন রূপকল্প এবং আংগিকের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অপূর্ব বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞার বলে নাট্য-সাহিত্যের সীমা হয়েছে সুপরিবর্ধিত, অভিনয়কলার ক্ষেত্রে ঘটেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কেহ কেহ বলেন যে তাঁর নাটকে অনেকস্থলে নির্লিপ্ততার (detachment) অভাব আছে। নাটকীয় মহান আত্মবিলোপ সেখানে নেই। কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব বা জীবন-সত্য (সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা না হলেও) তাঁর নাটকে স্বতঃই আভাসিত। নাটকের ভূমিকায় বা চিঠিপত্র প্রবন্ধাদিতে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। "আত্মোৎসর্জন দ্বারাই সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব"—রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই এই তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার ফলে নাটকীয় ঘটনার সহজ এবং অনিবার্য প্রবাহ ব্যাহত হয়েছে। সমালোচক-প্রবর মিঃ টমসনের মতে 'In Rabindranath's dramas, the pressure of thought often strangles the action.'[1]

1 Rabindra Nath Tagore—Poet & Dramatist
By Edward Thompson.

কথাটি বোধ করি একেবারে অস্বীকার করা চলে না। তবে ভাবাধিক্য-বশতঃ তাঁর নাটক জীবন-চেতনাহীন, অবাস্তব এরূপ উক্তি কোন ক্রমেই গ্রাহ্য নয়। অভিনয়ের মধ্যেই নাটকের সর্বাবয়ব ও সার্থক রূপায়ণ। অভিনয়-দর্শন কালে দর্শকবৃন্দ রবীন্দ্রনাটকে যে শিল্পলোকে উন্নীত হন সেখানে কোন ভাবাদর্শকেই অবাস্তব বলে মনে হয় না। সেখানে অতি সূক্ষ্ম চেতনার জাগ্রৎলোকে জীবনের নূতন রূপের সাক্ষাৎকার ঘটে, আর তা যে বাস্তব সত্য—এ বিষয়ে মন সংশয়মুক্ত হয়। সুদক্ষ পরিচালনায় এ-সত্য প্রমাণিত হয়েছে। 'রক্তকরবীর' মত স্থূল-ঘটনা-বিরল, শ্লথগতি এবং বিশেষ তত্ত্ব-সমন্বিত নাটক যে পরিচালনা গুণে একান্ত বাস্তব হয়ে ওঠে তা কি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নি? তাঁর অন্যান্য তত্ত্বমূলক নাটক সম্বন্ধেও এ-কথা সমভাবে প্রযোজ্য। তা ছাড়া স্মরণ রাখা ভালো যে শিল্পের বাস্তব এবং লৌকিক জীবনের বাস্তব এক নয়। আর বাস্তব সম্বন্ধে চরম কথা কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে অরিষ্টটলের Poetics থেকে একটি বচন উদ্ধৃত করছি, 'For the purpose of poetry a convincing impossibility is preferable to an unconvincing possibility'.[2] লৌকিক দৃষ্টিতে যত অসম্ভব বা অবাস্তব বলে মনে হোক না কেন অভিনয়কালে তা যদি দর্শকের বিশ্বাস-অর্জনে ও সন্তোষবিধানে সমর্থ হয় তবে শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে তা সার্থক। সার্থক শিল্পের রস যে অলৌকিক এ কথা ভুললে চলবে না। আরও কথা আছে, একযুগে যা ভাবসত্য পরবর্তী অন্য কোন যুগে তা বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করবে না, নিশ্চয়ই জোর করে এমন কথা বলা যায় না। কবির দৃষ্টিতে সেই সত্য—যা নিছক কালের ধর্ম নয়—যা বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের পরমরূপ—তাই-ই তো ধরা দেয়। আবার বাস্তবতাবিচারে সংখ্যা গণনা বা গণমানসের সাক্ষ্যই কি নির্ভর-যোগ্য নির্ভুল পন্থা?

রবীন্দ্র-নাটক কাহিনী-সর্বস্ব নয়। সেখানে চরিত্র-সৃজনে ও চরিত্রের গভীর রহস্যোদ্ঘাটনে সমধিক গুরুত্ব অর্পিত হয়েছে। সাধারণতঃ কাহিনীগুলি সরল ও স্বল্প-পরিসর। তবে ঘটনা-বিন্যাসে অনন্যতা ও চমৎকারিত্ব আছে। কোন কোন নাটকে (বিসর্জন, রাজা ও রানী, তপতী) শাখা-কাহিনী বা উপকাহিনী থাকলেও পাশ্চাত্ত্য নাটকের শাখায়িত বিস্তার, বৈচিত্র্য এবং

---

2 Aristotle—On the Art of Poetry.

ঘাত-প্রতিঘাতের প্রচণ্ডতা নেই। ক্ষেত্র বিশেষে একই কাহিনী পুনর্গৃহীত হয়েছে কিন্তু তা একইভাবে পুনরাবৃত্ত হয় নি। বিকাশ ও পরিণামের দিক থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। কোন কোন কাহিনীর পরিণামের অনিবার্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন্তু তা আদর্শগত সম্ভাব্যতার সীমা লংঘন করেছে বলে মনে হয় না। প্রায়শঃই নাটকের পরিণামে এক ধরণের সামঞ্জস্য আছে ও শান্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

চরিত্রসৃষ্টি প্রসংগে মিঃ টমসনের 'There is little differentiation of Charactor'[3] বা অন্য সমালোচকের অনুরূপ উক্তি বিতর্ক-মূলক। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এর বিপরীতই চোখে পড়ে। 'রাজা ও রানী'র সুমিত্রা ও ইলা এবং 'তপতী' নাটকের সুমিত্রা ও বিপাশা এক নয়। 'বিসর্জন' নাটকের রানী গুণবতী স্বতন্ত্র সৃষ্টি। 'অপর্ণা' চরিত্রের ধারাটি অনুসরণ করলেও বিভিন্ন স্তরে এর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য, বিক্রমদেব (উভয় নাটকেই), দেবদত্ত, কুমারসেন, জয়সিংহ, সুপ্রিয়, ক্ষেমংকর প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যে সত্যই কি পার্থক্য নেই? সাংকেতিক নাটকের চরিত্র-সমূহ প্রতীকধর্মী। তবুও তাদের মধ্যে পার্থক্যের ভেদরেখা সুস্পষ্ট। 'মুক্তধারা'—নাটকের কথাই ধরা যাক। এখানে কবি সচেতনভাবেই একটি বিশিষ্ট জীবনাদর্শ সংকেতিত করেছেন। এমন অবস্থায় চরিত্রের সজীবতা ও পার্থক্য রক্ষা করা সহজ নয়, তবুও তা রক্ষিত হয়েছে। রণজিৎ, বিশ্বজিৎ, অভিজিৎ এবং 'পরিত্রাণ' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের অনুরূপ চরিত্রসমূহের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাঁরা এবং এঁরা এক নন। শুধু কি তাই? যন্ত্ররাজ বিভূতি ও 'রক্তকরবী'র মকররাজ একই ভাবাদর্শের প্রতীক হলেও তাদের মধ্যে প্রভেদ অল্প নয়। তবে পার্থক্যের রেখাগুলি সূক্ষ্মতমভাবে টানা হয়েছে। অন্যান্য সাংকেতিক নাটকের চরিত্র সম্বন্ধেও এই কথা প্রয়োজ্য।

তাঁর সংলাপ-রচনা নাটকীয় গুণ অপেক্ষা কাব্যগুণে সমৃদ্ধতর। তা একান্ত ভাবেই লিরিক-লক্ষণাক্রান্ত বা গীতি-ধর্মী। অনেকক্ষেত্রে অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ এবং উচ্ছ্বাসময় যদিও ভাবৈশ্বর্যে বা সূক্ষ্ম-গভীর অনুভূতি প্রকাশে অনবদ্য। এর মধ্যে সেই সংহত, সংক্ষিপ্ত এবং সুতীক্ষ্ণ দ্বান্দ্বিকতা নেই যা তীব্র সংঘর্ষের মুখেই

3 Rabindra Nath Tagore—Poet & Dramatist
By Edward Thompson.

চরিত্রের অন্তররহস্য উদ্ঘাটিত করে ও পরিণামকে অনিবার্য ক'রে তোলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। এখানে শুধু সংলাপের সামান্য লক্ষণই উল্লিখিত হল।

রবীন্দ্র-নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংগ সংগীত। আমি গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের কথা বলছিনে, সেখানে ত সংগীতের অবিরাম প্রবাহের মধ্যেই ঘটনাবর্ত তীব্র হয়ে উঠে; আমি বলছি অন্য নাটকের কথা যেখানে ঘটনাপ্রবাহে সংগীতগুলি ফুলের মত ভেসে আসে এবং নাটকের ধ্রুবপদকে ধরে রাখে। এই সব ক্ষেত্রে এদের নাটকীয় মূল্য স্বীকার না করে পারা যায় না। রবীন্দ্র-রচনায় কি কাব্যে, কি নাটকে একটি ভাবার অতীত-তীর আছে, একটি অভাবনীয়ের রহস্যলোক আছে। সুরের জাদু ছাড়া অন্য কিছু কি দর্শকচিত্তকে সেই লোকে পৌঁছে দিতে পারত? সংগীতগুলি সেই অসীম রহস্যলোকের চাবি। তাই এগুলি নাটকের প্রবাহের পরিপন্থী নয় পরন্তু পরিপোষক ও অবিচ্ছেদ্য অংগ। 'তপতী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকের সংগীতগুলি আলোচনা করলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। তপতীর 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' এবং 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' গান দুইটির নাটকীয় উৎকর্ষ অসাধারণ। প্রথমটি তো নাটকের ধ্রুবপদকে ধরে আছে আর দ্বিতীয়টি নাটকের একটি পরম মুহূর্তে ঘটনাপ্রবাহ যখন তীব্রতা-ভীষণ কুটিল আবর্ত সৃষ্টি করে উদ্দাম হয়ে উঠেছে তখন তার উপরে সুরের জাদু নিক্ষেপ করে তাকে অপরূপ করে তুলেছে। এই মুহূর্তের পরম রূপটিকে বোধকরি এই সংগীত ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাবে প্রকাশ করা যেত না। 'রক্তকরবী'র 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' অথবা 'মুক্তধারা'র ভৈরবপন্থীর 'জয় ভৈরব, জয় শংকর' গান দুটি উক্ত নাটকদ্বয়ের ধ্রুবপদ। এই প্রসংগে স্মরণীয় যে 'ফাল্গুনী' নাটকের দৃশ্যগুলি গানের চাবি দিয়েই খুলতে হয়। এই গানগুলিকে বাদ দিলে নিশ্চয়ই নাটকের অঙ্গচ্ছেদ করা হয় এবং উৎকর্ষের হানি ঘটে। পরিবেশ-সৃজন ও বৈচিত্র্য-সঞ্চারের জন্যও এদের প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার অনেকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শ্লথ প্রবাহের মধ্যে এগুলি উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের মত গতিবেগের সৃষ্টি করে। অতএব রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি এই গানগুলিকে তাঁর নাটক থেকে উৎকর্ষহানি না ঘটিয়ে কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন করা চলে না, যেমন চলে না গ্রীক নাটকে। উভয়ত্রই গানের বিশেষ সার্থকতা স্বীকার্য।

বলাবাহুল্য আমার এ-আলোচনা অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। এই গ্রন্থে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত ও আলোচিত হ'ল। পরবর্তীকালে আরও কিছু যোজনা করার সদিচ্ছা রাখি। এই গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারে পরম প্রীতিভাজন শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করি। তাঁরই প্রচেষ্টায় এ গ্রন্থ প্রকাশিত হল।

গ্রন্থকার

পিঃ ৬১ নটবর পাল রোড
হাওড়া
পৌষ সংক্রান্তি ১৩৬৩

রবীন্দ্রনাথের অচলিত নাটক

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহে 'রুদ্রচণ্ড', 'কালমৃগয়া' ও 'নলিনী' নাট্যত্রয় মুদ্রিত হয়েছে। পরিশিষ্টে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম সংস্করণও মুদ্রিত করা হয়েছে কিন্তু এই গীতি-নাট্যখানি নানাকারণে অচলিত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। অতএব এই প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত নাট্যত্রয়ই আলোচিত হ'বে। এগুলি রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা। এদের মধ্যে প্রতিভার বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণ বা অতলস্পর্শ গভীরতা নেই, থাকবার কথাও নয়। এগুলি অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক। বৃহত্তর সাধনার পথে প্রস্তুতির প্রয়াস মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তা ভাল করেই জানতেন। তাই এগুলির প্রকাশ ব্যাপারেও তাঁর কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। এই অচলিত রচনাগুলি প্রচলিত না হয় এই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। তাঁর মতে "যে-বাণীর শিল্প-আবরণ গেছে জীর্ণ হয়ে সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করবার মতো তার আব্রু নেই।" তবে তার ঐতিহাসিক মূল্য দ্বিধাভরে হলেও তিনি অস্বীকার করেন নি, "প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছয় নি তারও মূল্য আছে হয়তো ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে, তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পাসপোর্ট পেয়ে থাকে।" আমরা বলি 'হয়তো' নয়, ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্যই তা মূল্যবান। তা ছাড়া অন্যান্য নানা কারণেও এই রচনাগুলির বিশেষ মূল্য আছে। প্রথমতঃ সমগ্র রবীন্দ্র-প্রতিভার দিক্‌দর্শনের ক্ষেত্রে এই অপরিপক্ক রচনাগুলির প্রয়োজনীয়তা কম নয়, দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুবিচিত্র ও বহু-শাখায়িত বিস্তার হলেও তা একটি ভাবগত ঐক্যসূত্রে বিধৃত। তাঁর অপরিণত এবং অসম্পূর্ণ সাহিত্য-সৃষ্টির বহুল কৃত্রিমতার মধ্যেও এই ঐক্য একান্ত স্বচ্ছতায় স্থির হয়ে আছে—'স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু ঘূর্ণির মাঝখানে।" সম্পাদক

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থই বলেছেন, "এইগুলির মধ্যে তাঁহার পরিণত জীবনের বহুমনন ও কল্পনার সূত্র মিলিবে।" পরিণত বয়সের সার্থকতম সৃষ্টির মধ্যে ফলপুষ্পে সুশোভিত বিরাট মহীরুহ-রূপে যে ভাবসত্য প্রকাশিত হয়েছে এইসব রচনার মধ্যে তা বীজ এবং অঙ্কুররূপে বিদ্যমান একথা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য। রবীন্দ্র-তীর্থযাত্রীর পক্ষে এগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হয়।

রবীন্দ্র-নাট্য-প্রসঙ্গে এবার দু-একটি গুরুতর কথার আলোচনা করা যাক্। আমার বিশ্বাস যে এই-কথা আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 'জীবন-স্মৃতি'তে গৃহ-শিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ম্যাকবেথ নাটক তর্জমার কথা আছে। "আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্যপথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ওই পরিমাণে হালকা হইয়াছে।" (ঘরের পড়া, জীবনস্মৃতি) কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ম্যাকবেথ-অনুবাদের 'ডাকিনী-অধ্যায়' বিলুপ্ত হয় নি। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস উহা ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী' থেকে উদ্ধার করেছেন। (শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৬)। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৯ বৎসর কয়েক মাস তখন উহা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু তিনি বহুপূর্বেই ম্যাকবেথ পাঠ এবং তার অনুবাদ শেষ করেছিলেন। অন্যত্র এর প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৩ বৎসর ৭ মাস তখন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'অভিলাষ' শীর্ষক কবিতাটি

রবীন্দ্রনাথের অচলিত নাটক

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহে 'রুদ্রচণ্ড', 'কালমৃগয়া' ও 'নলিনী' নাট্যত্রয় মুদ্রিত হয়েছে। পরিশিষ্টে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম সংস্করণও মুদ্রিত করা হয়েছে কিন্তু এই গীতি-নাট্যখানি নানাকারণে অচলিত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। অতএব এই প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত নাট্যত্রয়ই আলোচিত হ'বে। এগুলি রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা। এদের মধ্যে প্রতিভার বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণ বা অতলস্পর্শ গভীরতা নেই, থাকবার কথাও নয়। এগুলি অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক। বৃহত্তর সাধনার পথে প্রস্তুতির প্রয়াস মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তা ভাল করেই জানতেন। তাই এগুলির প্রকাশ-ব্যাপারেও তাঁর কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। এই অচলিত রচনাগুলি প্রচলিত না হয় এই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। তাঁর মতে "যে-বাণীর শিল্প-আবরণ গেছে জীর্ণ হয়ে সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করবার মতো তার আব্রু নেই।" তবে তার ঐতিহাসিক মূল্য দ্বিধাভরে হলেও তিনি অস্বীকার করেন নি, "প্রকাশের পুর্ণতায় যা পৌঁছয় নি তারও মূল্য আছে হয়তো ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে, তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পাসপোর্ট পেয়ে থাকে।" আমরা বলি 'হয়তো' নয়, ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্যই তা মূল্যবান। তা ছাড়া অন্যান্য নানা কারণেও এই রচনাগুলির বিশেষ মূল্য আছে। প্রথমতঃ সমগ্র রবীন্দ্র-প্রতিভার দিক্‌দর্শনের ক্ষেত্রে এই অপরিপক্ক রচনাগুলির প্রয়োজনীয়তা কম নয়, দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুবিচিত্র ও বহু-শাখায়িত বিস্তার হলেও তা একটি ভাবগত ঐক্যসূত্রে বিধৃত। তাঁর অপরিণত এবং অসম্পূর্ণ সাহিত্য-সৃষ্টির বহুল কৃত্রিমতার মধ্যেও এই ঐক্য একান্ত স্বচ্ছতায় স্থির হয়ে আছে—'স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু ঘূর্ণির মাঝখানে।" সম্পাদক

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থই বলেছেন, "এইগুলির মধ্যে তাঁহার পরিণত জীবনের বহুমনন ও কল্পনার সূত্র মিলিবে।" পরিণত বয়সের সার্থকতম সৃষ্টির মধ্যে ফলপুষ্পে সুশোভিত বিরাট মহীরুহ-রূপে যে ভাবসত্য প্রকাশিত হয়েছে এইসব রচনার মধ্যে তা বীজ এবং অঙ্কুররূপে বিদ্যমান একথা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য। রবীন্দ্র-তীর্থযাত্রীর পক্ষে এগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হয়।

রবীন্দ্র-নাট্য-প্রসঙ্গে এবার দু-একটি গুরুতর কথার আলোচনা করা যাক্। আমার বিশ্বাস যে এই-কথা আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 'জীবন-স্মৃতি'তে গৃহ-শিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ম্যাকবেথ নাটক তর্জমার কথা আছে। "আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্যপথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ওই পরিমাণে হালকা হইয়াছে।" (ঘরের পড়া, জীবনস্মৃতি) কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ম্যাকবেথ-অনুবাদের 'ডাকিনী-অধ্যায়' বিলুপ্ত হয় নি। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস উহা ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী' থেকে উদ্ধার করেছেন। (শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৬)। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৯ বৎসর কয়েক মাস তখন উহা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু তিনি বহুপূর্বেই ম্যাকবেথ পাঠ এবং তার অনুবাদ শেষ করেছিলেন। অন্যত্র এর প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৩ বৎসর ৭ মাস তখন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'অভিলাষ' শীর্ষক কবিতাটি

মুদ্রিত হয়। কিন্তু এ-কবিতা আরও এক বৎসর পূর্বের রচনা। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী থেকে জানা যায় যে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য যখন রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৩ বৎসর (১৮৭৫ খ্রীঃ) এবং 'অভিলাষ' কবিতাটি কবির ১২ বৎসর ৭ মাস বয়সে লিখিত হয়েছিল। এই কবিতার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(২৫)

ঐ দেখ গুপ্তহত্যা করিয়া বহন
চলিয়াছে অঙ্গুলির পরে ভর দিয়া—
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখ।

(২৬)

হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে
সুখের আশায় বৃথা সুখের আশায়
ঐ দেখ, ঐ দেখ রক্তমাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।*

কবিতোক্ত ঘটনা ম্যাকবেথ-কর্তৃক ডানক্যান-হত্যারই কাহিনী। এর থেকে বোঝা যায় তিনি এই বয়সেই ম্যাকবেথ নাটকের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত এবং সেক্সপীয়রের প্রতিভার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ 'জীবনস্মৃতির' উক্ত অংশে কুমারসম্ভব পড়ার কথাও আছে কিন্তু কুমারসম্ভবের অনুবাদের কথার স্পষ্টতঃ উল্লেখ নেই। তবে কুমারসম্ভবের কিছুটা যে তিনি অনুবাদ করেছিলেন তা ১২৮৪ সালের মাঘ সংখ্যা 'ভারতীর' সম্পাদকীয় বৈঠকের শেষে 'মদনভস্ম' কবিতা থেকে বুঝতে পারা যায়। এখানে এ-সকল কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-জীবনের সূচনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দুই মহাকবির সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর

*অভিলাষ, জীবনস্মৃতি

নাটকে উভয় কবির প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর Revenge নাটকে (রুদ্রচণ্ড, বিসর্জন, রাজা ও রানী ও মালিনী) সেক্সপীয়রের প্রভাব লক্ষণীয় নয় কি? 'মালিনী'র ভূমিকায় তিনি স্পষ্টতঃ এ-কথা স্বীকার করেছেন—'সেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি, ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।' আবার কুমার-সম্ভবের তথা কালিদাসের অন্যান্য রচনার ভাবনা ধারণা ও প্রেমাদর্শ যে রবীন্দ্র-ভাবনার একান্ত অনুকূল হয়েছিল—এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেক্সপীয়র প্রচণ্ড-জীবন ধর্মের কবি, তাঁর নাটক দেহদশাধীন বিরাট মানবের প্রবৃত্তির দুর্ধর্ষ সংঘাতময় (Grand passions) লীলায় পরিপূর্ণ। নাটকীয়তা তাঁর প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ। আর কালিদাস নাটক লিখলেও গীতি-ধর্মিতা তাঁর নাটকের বিশেষ ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশেষভাবে গীতিধর্মী। এইজন্য শান্তরসের অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের দ্বারাই তা বিশেষভাবে প্রভাবিত। পরবর্তীকালে এই প্রভাব সমধিক পরিবর্ধিত হয়েছে। অবশ্য উভয়েই ভারতীয় আদর্শের কবি। প্রভাবের কথা না বলে উভয়ের ভাবনা-ধারণা যে একই সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছে—এই কথা বলাই সংগত। তবে এ-কথাও সত্য যে রবীন্দ্রনাথের নাটকে, অচলিত নাটকে ত বটেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের—এই দুই মহাকবির প্রভাবই বর্তমান আছে। আসল কথা রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রের আদর্শে নাটক লিখতে চেয়েছেন কিন্তু তাঁর প্রতিভার স্বধর্ম তাঁর নাটকে গীতি-ধর্মিতাসুলভ রূপান্তর ঘটিয়েছে। ফলে যা হয়েছে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু—এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

এইবার রবীন্দ্রনাথের প্রথম অচলিত নাটক 'রুদ্রচণ্ড'-এর আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক (গীতি-নাট্য নহে) ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন কলিকাতা বাল্মীকি-যন্ত্রে কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত হয়। অবশ্য তাঁর প্রথম গীতি-নাট্য 'বাল্মীকির প্রতিভা' মাত্র কয়েকমাস পূর্বেই রচিত হয়েছে। 'রুদ্রচণ্ড'-রচনাকালে কবির বয়স ছিল ১৯ বৎসর মাত্র। এই নাটকে অংক বিভাগ নেই। চতুর্দশ দৃশ্য-সমন্বিত নাটকটির প্রধান চরিত্র রুদ্রচণ্ড, চাঁদকবি ও রুদ্রচণ্ডের কন্যা অমিয়া। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রও আছে যেমন সেনাপতি, দ্বাররক্ষক, দূত ও নাগরিকবৃন্দ। নাটকটির নায়ক রুদ্রচণ্ড, চাঁদ কবিকে প্রতিনায়ক বলা চলে।

নাটকটি বিষাদান্ত বা ট্র্যাজেডি। হস্তিনাধিপতি পৃথ্বীরাজ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত রুদ্রচণ্ড তাঁর পরে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন। হৃদয় থেকে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা বিসর্জন দিয়ে অনির্বাণ প্রতিহিংসাগ্নি বক্ষে ধারণ করত শ্বাপদসংকুল অরণ্যের ভয়াবহতা ভীষণতর করে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রতিশোধের বাসনা তাঁর এমনই উগ্র ও প্রচণ্ড যে একমাত্র মাতৃহারা কন্যা অমিয়াকে তাঁর অভীষ্ট-সিদ্ধির অন্তরায় ভেবে তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত নন। কাল-ভৈরব তাঁর উপাস্য দেবতা, ছুরিকা তাঁর একমাত্র সঙ্গী। অভাগিনী অমিয়া প্রকৃতি-দুহিতা শকুন্তলার ন্যায় কোমল-হৃদয়া ও সংসারানভিজ্ঞা। হৃদয়টি তার প্রীতিরসে ভরা। পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে সে পৃথ্বীরাজের সভাকবি ভ্রাতৃ-প্রতিম চাঁদের স্নেহ-প্রীতির মধ্যে আশ্রয় ও সান্ত্বনা খুঁজেছে। পিতার প্রতিশোধস্পৃহা সে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না। এইখানে পিতার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব। রুদ্রচণ্ড চাঁদকবিকে সহ্য করতে পারেন না। বিরোধ প্রবল হয়ে উঠল। কন্যার সকাতর প্রার্থনা ও চাঁদকবির অনুনয় সকলই ব্যর্থ হল। রুদ্রচণ্ড চাঁদকবিকে অমিয়ার সঙ্গিরূপে দেখে তাঁকে আক্রমণ করলেন। চাঁদ প্রত্যাক্রমণ করায় তাঁর পরাভব ঘটল। তিনি প্রাণভিক্ষা চাইলেন, কারণ প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁকে বাঁচতেই হবে। এমন সময়ে আসন্ন-যুদ্ধের প্রয়োজনে রাজসভা থেকে দূত এসে আহ্বান জানাতে চাঁদকবি

দ্রুত প্রস্থান করলেন। এই দৃশ্যে ঘটনার সংঘর্ষ ও নাটকীয় তীব্রতা লক্ষনীয়। অবশ্য কবি অমিয়ার মূর্চ্ছা ঘটিয়ে সমস্যার সহজ সমাধান করেছেন, তবে তার মূর্চ্ছাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। (১ম—৩য় দৃশ্য)

অতঃপর চাঁদকবির করুণালব্ধ জীবন লাভ করে রুদ্রচণ্ডের জীবন আরও বিষময় হয়ে উঠেছে। প্রতিহিংসান্তে তিনি প্রাণত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করলেন। জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত তাঁর হৃদয় কঠোরতর হয়ে উঠল। অমিয়ার প্রতি তাঁর আচরণ নিষ্ঠুরতর হ'ল। তার অশ্রুবদ্ধবাণী তাঁকে টলাতে পারলে না। তিনি তাকে দূর ক'রে দিতে উদ্যত হলেন। প্রতিহিংসার অনলে তাঁর সমস্ত কোমল বৃত্তি যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অমিয়া ভয়ে হতাশায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল—তিনি তাকে নিয়ে বনান্ত উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। (৪র্থ দৃশ্য।)

পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যায় অমিয়া পিতাকে ছেড়ে চাঁদকবির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। সে রাজপথস্থিত কবির প্রাসাদ-সম্মুখে এসে দাঁড়াল। পাষাণ-কায়া রাজপ্রাসাদ তার কাছে রুদ্ধ—দ্বাররক্ষী তাকে বিতাড়িত করে দিল। জনৈক বন-নিবাসী পান্থ সস্নেহে তাকে বনকুটিরে নিয়ে গেলেন।

রণক্ষেত্রস্থ শিবিরে চাঁদকবি অবস্থান করছেন। ভগিনীসমা অভাগিনী অমিয়ার জন্য তার চিত্ত একান্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তিনি শমনসদৃশ পিতার কবল থেকে অমিয়াকে উদ্ধার করে তাকে সুখের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা করেছেন। তাদের সৌভ্রাত্র-বন্ধনটি কতখানি অকৃত্রিম ও সুদৃঢ় ষষ্ঠ দৃশ্যে চাঁদকবির স্বগতোক্তিতে তার প্রকাশ আছে :—

আপনার ঘরে আনি রাখিব যতনে,
এতদিনকার দুঃখ দিব দূর করে।
রাজপুত ক্ষত্রিয়েরে করিবি বিবাহ
ভালোবেসে দুইজনে কাটাবি জীবন।

অন্ধকার অরণ্যের রুদ্ধ বাল্যকাল
দুঃস্বপনের মত শুধু পড়িবেক মনে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে উপন্যাসে যে সৌভ্রাত্রভাবের প্রকাশ দেখি এখানে তার পূর্বাভাস।

অতঃপর চাঁদকবি যুদ্ধার্থ যাত্রা করেছেন। ইতিমধ্যে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মহম্মদ ঘোরীর যুদ্ধ রীতিমত ঘনিয়ে উঠেছে। বহুদূর পর্যটনে শ্রান্ত সৈন্যদলসহ ঘোরী রুদ্রচণ্ড-অধিকৃত অরণ্য-অঞ্চলে একরাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে তাঁর কাছে দূত পাঠালেন। তাঁর অন্য ইচ্ছাও গোপন রইল না। রুদ্রচণ্ড দূতের এই হীন প্রস্তাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ঘোরীর সঙ্গে যোগদান করে প্রতিহিংসা সাধন করবার প্রস্তাবে তাঁর পৌরুষ আহত হল। তিনি গর্জন করে উঠলেন :—

মহম্মদ ঘোরী ?
কেন আমার কি কাছে ছুরি নাই, মূঢ়
এতদিন বক্ষে তারে করিনু পোষণ,
প্রতি দণ্ডে দণ্ডে তারে দিয়েছি আশ্বাস,
আজ কোথা হতে আসি মহম্মদ ঘোরী
তাহার মুখের গ্রাস লইবে কাড়িয়া ?
যেমন পৃথ্বীর শত্রু মহম্মদ ঘোরী
তেমনি আমারো শত্রু, কহি তোরে দূত।
পৃথ্বীর রাজত্ব প্রাণ এসেছে কাড়িতে,
সমস্ত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে।
এখনি নগরে যাব কহি তোরে আমি,
অশুভ বারতা এই করিবু প্রচার।

প্রতিহিংসানল তাঁর সমস্ত কোমলবৃত্তিকে দগ্ধ করেছে সত্য কিন্তু তাঁর পৌরুষকে বিনষ্ট করতে পারে নি। তিনি বীরের মতই প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান—এ যে শৌর্যভূয়িষ্ঠ মানুষের পবিত্র

কর্তব্য। এখানে হীন কাপুরুষতার স্থান কোথায়? তাই দূতের ঘৃণ্য প্রস্তাবে তিনি উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মত তাকে আক্রমণ করলেন। রুদ্রচণ্ডের রুদ্রমহিমা প্রকাশিত হল।

অষ্টম দৃশ্যে সেনাপতিবৃন্দ ও সৈন্যগণসহ চাঁদকবি পথ দিয়ে চলেছেন। নেপথ্য থেকে অমিয়ার করুণ কণ্ঠসঙ্গীত ভেসে এল। তিনি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু সেনাপতির কাছে হিন্দুসৈন্যের পরাজয় বার্তা শুনে তাঁকে ত্বরান্বিত হ'তে হল। সহসা অমিয়া এসে পড়ল, কিন্তু হায় সময় যে নেই। রণবাদ্য বেজে উঠেছে। ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিপর্যয় আসন্ন। অমিয়ার দিকে চাইবার সময় কোথায়? তিনি চলে গেলেন। প্রত্যাখ্যাতা অমিয়া অবসন্ন হয়ে পথের মাঝে বসে পড়ল।

রুদ্রচণ্ড পৃথ্বীরাজের সংবাদের জন্য ব্যাকুল চিত্তে নগরে প্রবেশ করলেন। তাঁর ভয়—পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিহত হ'লে প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। পথিকবৃন্দ তাঁর অদ্ভুত প্রশ্নে তাঁকে ধিক্কার দিতে লাগল। এদিকে অমিয়াও পথে পথে ঘুরছে। চাঁদের প্রতি অভিমানে তার হৃদয় ভেঙ্গে পড়েছে। চাঁদকবি যে একান্ত নিরুপায় হয়েই তাকে সম্ভাষণ করতে পারেন নি সে-কথা সে ভাবতেই পারছে না।

চাঁদ চাঁদ ভাই মোর দেখা হ'ল যদি,
একবার ডাকিলে না 'অমিয়া' বলিয়া?

যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ঘটল—তিনি বন্দী হলেন। শোকোন্মত্ত নাগরিকবৃন্দ হস্তিনা নগরীর গৃহে গৃহে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘরে ঘরে চিতানল জ্বলে উঠল। নগরবাসী মেতে উঠল মরণ-উৎসবে।

মরণ-উৎসব আজি হইবে নগরে
চিতার মশাল জ্বালি শোণিত-মদিরা
যমরাজ আজরাত্রে করিবেন পান।

অতঃপর পৃথ্বীরাজ বন্দী অবস্থায় নিহত হলেন। রুদ্রচণ্ড

এ-কথা শুনলেন। তাঁর সকল আশা চিরতরে নির্মূল হয়ে গেল। ভিক্ষা-লব্ধ জীবন ইতিমধ্যেই তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়েছিল—

ঋণ করা প্রাণ আর বহিতে পারিনা
কবে তোরে ত্যাগ করে বাঁচিব আবার ?

এইবার তার প্রয়োজন শেষ হয়েছে,

মুহূর্তে জগৎ মোর ধ্বংস হয়ে গেল,
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।

মৃত্যুসংকল্প গ্রহণ করে তিনি নিজদেহে ছুরিকাবিদ্ধ করতে লাগলেন। অমিয়া এসে তার সম্মুখে দাঁড়াল।

'পিতা, পিতা, অমিয়ারে ক্ষমা কর পিতা।' এতদিন পরে রুদ্ধ পিতৃস্নেহের দ্বার খুলে গেছে। তিনি অভাগিনী কন্যাকে বুকে টেনে নিলেন। শেষ মুহূর্তে পিতৃবক্ষে তার আশ্রয় মিলল। মৃত্যু-পথযাত্রী পিতা কন্যাকে সান্ত্বনা ও আশিস দান করলেন,

আজ তোরে কি করিয়া সুখী করি, বাছা ?
আশীর্বাদ করি বাছা, জন্মান্তরে যেন
এমন নিষ্ঠুর পিতা তোর নাহি হয়।
অমিয়া মা কাঁদিসনে, থাক বুকে থাক।

পৃথ্বীরাজ মৃত, অমিয়ার কোন সন্ধান নেই। চাঁদকবির জীবনের প্রয়োজনও বুঝি ফুরিয়ে গেছে। তিনি সংসারত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। অতঃপর তিনি দেশে দেশে পৃথ্বীরাজের যশোগান করে ফিরবেন ও অভাগিনী অমিয়ার সন্ধান করবেন—তিনি কিছুতেই তার করুণ মুখখানি ভুলতে পারছেন না—

"করুণ সে মুখখানি, দীন হীন বেশ
আঁখির সামনে ছিল ছবির মতন।

আকাশের পটে আঁকা সে মুখ হেরিয়া
ভীষণ সমর-ক্ষেত্রে কাঁদিয়াছি আমি।"

তিনি অরণ্যে প্রবেশ করে রুদ্রচণ্ডের গৃহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন—গৃহ মৃত্যুর মত স্তব্ধ। চোখে পড়ল, রুদ্রচণ্ড মৃত আর অমিয়া মুমূর্ষু। দুঃখবেদনা ও হতাশায় বালিকা একেবারে ভেঙে পড়েছে। শেষ কথা নিবেদন করবার জন্যই যেন সে কোন রকমে এতক্ষণ প্রাণ ধারণ করেছিল—

কোথা তুমি ভাই ?
সংসার চোখের পরে আসিছে মিলায়ে।
ত্বরা করি বল চাঁদ, সময় যে নাই
একবার দাঁড়ালে না, চলে গেলে ভাই ?

এই তার শেষ কথা। মৃত্যু ঘটল—চাঁদকবির উত্তর আর শোনা হ'ল না। মর্মান্তিক বেদনায় চাঁদকবি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর শেষ-উক্তি 'রাজা ও রাণী'র বিক্রমদেবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রচনা অপরিপক্ক, তবে স্থানে স্থানে কল্পনার মায়াস্পর্শ আছে। নাটকটি কাব্যধর্মী ও বর্ণনাত্মক। প্লটের গুরুত্ব নেই—ঘটনা সংঘাতের তীব্রতাও চোখে পড়ে না। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিবেশ যে নেই তা নয়, তবে তার চূড়ান্ত পরিণাম নেই। কবি কয়েকটি সিচুয়েশন সৃষ্টি করেছেন। চরিত্র সৃষ্টিও ত্রুটি-সমন্বিত; তবে রুদ্রচণ্ডের চরিত্র অপেক্ষাকৃত জীবন্ত। তাঁর শৌর্য, উগ্র প্রতিশোধ-স্পৃহা ও জাগ্রত পৌরুষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অমিয়া ও চাঁদকবির চরিত্র একান্ত ভাবেই ভাব-প্রবণ। তাদের বর্ণনায় লিরিক সুরটি প্রাধান্য লাভ করেছে। তাদের সম্পর্কটি ভ্রাতা-ভগিনীর। উদয়াদিত্য ও বিভা এবং কুমারসেন ও সুমিত্রার কথা তারা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে সম্পর্কটি প্রেমের হ'লে ভাল হ'ত।

'রুদ্রচণ্ড' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিশোধমূলক নাটক—(Revenge Drama) তিনি ইতিমধ্যে সেক্সপীয়র পড়েছেন।

এ-নাটক তার অক্ষম অনুকরণ। কিন্তু চণ্ডের চরিত্রে যে পৌরুষ লক্ষ্য করা যায় তা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি। তিনি প্রতিশোধের ভার নিজে হাতে তুলে নিয়েছেন, ঘোরীর সহায়তা নিতে স্বীকৃত হন নি। সাধারণ villain চরিত্রের সঙ্গে এইখানে তাঁর পার্থক্য অথবা এইখানে তিনি মহৎ। নাটকটি প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষরে লিখিত। স্থানে স্থানে চরণগুলিকে ভেঙ্গে দু-তিনটি চরিত্রের মুখে দেওয়া হয়েছে। ফলে ছন্দোবৈচিত্র্য ও নাটকীয়তা বেড়েছে।

তৃতীয় ও সপ্তম দৃশ্যে নাটকের সংকট-মুহূর্ত। এই দৃশ্যদ্বয়ে ঘটনাস্রোত তীব্র হয়ে উঠেছে। তৃতীয় দৃশ্যে চাঁদকবি ও অমিয়াকে একান্তে সংলাপরত দেখে রুদ্রচণ্ড উন্মত্তবৎ চাঁদকবিকে আক্রমণ করেছেন এবং পরাভূত হয়ে তাঁর নিকট প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন। এখানে ভাষা ও ছন্দ যথার্থ নাট্যোপযোগী হয়ে উঠেছে। পরাভূত রুদ্রচণ্ড প্রাণ ভিক্ষা ক'রে বলেছেন।

> আজ আমি মৃত সে রুদ্রের নাম লয়ে
> কেবল শরীর তার, কহিতেছি তোরে—
> এখনো জীবনে মোর আছে প্রয়োজন।
> এখনো এখনো আছে। এখনো আমার
> সংকল্প রয়েছে হয়ে দারুণ তৃষিত।
> রুদ্রচণ্ড তোর কাছে ভিক্ষা মাগিতেছে
> আর কি চাহিস চাঁদ? দিবি মোরে প্রাণ?

দুঃখ-বেদনা, তীব্র ঘৃণা তাঁর আবেগোত্তেজিত আর্তকণ্ঠে ভেঙে পড়েছে।

সপ্তম দৃশ্যে মহম্মদ ঘোরীর প্রেরিত গুপ্তচর হীন প্রস্তাব ক'রে ক্রুদ্ধ রুদ্রচণ্ডকে বলছে—

> ধৈর্য্য ধর। পৃথ্বী তব রাজ্যধন লয়ে
> নির্বাসিত করেছেন এ অরণ্য দেশে।
> প্রতিহিংসা সাধিবার সাধ থাকে যদি

এই তার উপযুক্ত হয়েছে সময়।
মহম্মদ ঘোরী হেথা—

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে তিনি আহত ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে যা বলেছেন তাতে পৌরুষের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে। এই আলোচনায় অন্যত্র তার উল্লেখ আছে।

এই সকল স্থানে ভাষার ওজস্বিতা ও গাঢ়বন্ধতা লক্ষণীয়। নাটকে দুটি গান আছে—গান দুটি চমৎকার।

'কালমৃগয়া'—রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অচলিত নাটক, এটি গীতি-নাট্য। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতি-নাট্য বাল্মীকি-প্রতিভা, 'কালমৃগয়া'র প্রায় ২১ মাস পূর্বে রচিত হয়ে থাকবে। এই গীতি-নাট্যখানি ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বিদ্বজ্জন সমাগম-উপলক্ষে অভিনয়ার্থে এটি রচিত হয়েছিল। বাল্মীকি-প্রতিভার মত "ইহা সুরে নাটিকা অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার কাব্য-বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থানেই আছে।"* বাল্মীকি-প্রতিভা-সম্বন্ধে তিনি আরও কয়েকটি কথা বলেছেন, সেগুলি 'কালমৃগয়া'-সম্পর্কে সমভাবেই প্রযোজ্য।

"আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে, তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমান-সঙ্গত রীতিমতো সঙ্গীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন গান হিসাবে এও সেইরূপ। ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই একটা লয়ের মাত্রা আছে; ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা। কোন বিশেষ রাগিনী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে।" পরবর্তীকালে তাঁর

*বাল্মীকি-প্রতিভা, জীবনস্মৃতি

নৃত্য-নাট্যে এই আংগিক যে কতখানি সার্থক হয়ে উঠেছে এই প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়।

এই গীতি-নাট্যখানি সম্বন্ধে তিনি নানাসময়ে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটা গীতি-নাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম 'কালমৃগয়া'। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র-বধ তাহার নাট্য বিষয়। তেতলার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল। ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে এই গীতি-নাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।" (বাল্মীকি-প্রতিভা, জীবনস্মৃতি)। "ইহার পরে দশরথ কর্তৃক মৃগ-ভ্রমে মুনি-বালক-বধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া গীতি-নাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহাও অভিনীত হইয়াছিল। তাহাতে আমি অন্ধমুনি সাজিয়াছিলাম।" 'ভারত-বন্ধু' সংবাদপত্রে এই অভিনয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল,—"বিদ্বজ্জন-সমাগম। গত শনিবার রাত্রে (১৮৮২, ২৩ ডিসেম্বর) ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম হইয়াছিল। এই সমাগম উপলক্ষে 'কালমৃগয়া' নামক একখানি ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য রচিত হইয়া ঐ রাত্রে অভিনীত হয়। অভিনয় অনেকাংশে সুন্দর হইয়াছিল। গৃহদেবীরা বনদেবী সাজিয়া অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন। বিদূষকের অভিনয়ের শেষাংশ ভাল হয় নাই। মুনিকুমার পিতার নিমিত্ত জল আনিতে গেলে লীলা তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে অন্ধমুনির নিকট যেরূপ গান গাহিয়াছিল তাহা শুনিলে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়।"

জীবন-স্মৃতিতে তিনি বলেছেন যে "একটা দস্তুরভাঙা গীত-বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।" এই সকল আলোচনা থেকে 'কালমৃগয়া'র মূল্য বোঝা যা ।

নাট্য-কাহিনীটি পৌরাণিক ও সর্বজনবিদিত। কিন্তু কবি এটিকে নূতন করে সৃষ্টি করেছেন। 'লীলা' সম্পূর্ণ নূতন চরিত্র। চরিত্রটি হয়তো সার্থক ও পূর্ণাবয়ব রূপ পরিগ্রহ করে নি কিন্তু সে পরবর্তী কালের বহু নাটকের এই ধরণের বহু চরিত্রের পূর্বাভাস সূচিত করেছে। অমিয়া, লীলা, রঘুর দুহিতা এবং অর্পণা—এরা সকলেই এক শ্রেণীর চরিত্র। লীলা যেন বিশেষ করে অর্পণার প্রথম রূপায়ন। এদের মধ্যে—নাটকে গীতি-কবিতার গভীরতম করুণ সুরটি ধ্বনিত হয়েছে; নায়ক চরিত্রের পরিবর্তন-সাধন ব্যাপারে এদের নাটকীয় প্রয়োজন আছে। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে লীলা শুধু নাটকের করুণ সুরটাকেই ধরে রেখেছে। হিমালয়ের বুকে জাহ্নবী-ধারার ন্যায় নাটকের ঘটনা-সংঘাতময় পরিবেশের মধ্যে এই চরিত্রগুলি গীতি-কবিতার প্রবাহ বহিয়ে দেয়—এরা যেন কবির গীতিময় সত্তারই শরীরিনী মূর্তি। লীলা গীতিময় করুণ-রসের একখানি মধুর আলেখ্য।

বিদূষক চরিত্র এই গীতি-নাট্যে নূতন সংযোজনা এবং চরিত্রটি জীবন্ত। এর সঙ্গে শকুন্তলা নাটকের বিদূষকের সাদৃশ্য আছে। শ্রমকুণ্ঠ, কর্মবিমুখ এবং ভোজনপটু বিদূষকের চরিত্র চমৎকার হয়েছে। তাকে ঘেরে হাস্যরসের উচ্ছলতা করুণ রসের একটানা প্রবাহের মধ্যে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করেছে। নাটকের করুণ রস—বর্ষার মেঘ-নিবিড়তা এবং অরণ্যের অন্ধকারময় পরিবেশে বিদূষকের চরিত্র এক ঝলক তির্যক আলোক-রেখার মতই এসে পড়েছে। তার সংলাপের ভাষা লক্ষণীয়—খাঁটি চলতি বাংলাভাষা। সে একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী। চরিত্রটির অপূর্বতা আছে। তার গান দুটি মধুর ও উপভোগ্য। শিকারিগণের দৃশ্যটি মন্দ নয়। তবে বর্ষার চিত্রখানি সুন্দর জমে উঠেছে। বর্ষা-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। প্রথম বয়সের এই নাটকেও তার পরিচয় আছে। চতুর্থ দৃশ্যে বনদেবতা ও বনদেবীগণের তিনটি বর্ষা সঙ্গীত আছে। গগনে গগনে সঘন ঘন,

স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,—ঘোর রজনী। অকস্মাৎ ক্ষণিকের এই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে মেঘের গুরু গুরু গর্জন শোনা গেল, ছুটে গেল চকিত বিদ্যুৎ-চমক, বেজে উঠল কড় কড় শব্দ। ঝর ঝর বারিধারা, নামল ঘন বর্ষণ। পশুপক্ষী তরুলতা এবং মানব হৃদয়কেও বর্ষার আবির্ভাব উৎসব-মুখর করে তুলেছে। বর্ষা-চিত্রটির অপূর্বতা মনকে স্পর্শ না করে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশেষ ভাবেই পরিবেশ-সৃজনক্ষম—এখানে সেই শক্তির চমৎকার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বেদমন্ত্র-পাঠ নাটকের গম্ভীর ভাবকে আরও পরিপুষ্ট করেছে—এটিও অভিনব ব্যাপার। প্রভাতী সংগীতটি ভাবে ও ভাষায় অপরূপ—মৃত্যু এখানে অমৃতে পরিণত হয়েছে। নাটকটি বর্ণনাত্মক, সংঘাত নেই বললেই হয়। এর স্থায়ী রসটি করুণ।

নলিনী। নাট্য; ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের এটি তৃতীয় নাটক। কোন অঙ্ক-বিভাগ নেই—মাত্র ছয়টি দৃশ্যে সমাপ্ত। নাটক না বলে নলিনীকে নাট্য-প্রয়াস বললেই সংগত হয়। আগাগোড়া গদ্যে রচিত, অবশ্য কয়েকটি গান আছে। গদ্য-রচনায় কবিত্ব আছে, ভাবের বাষ্প আছে কিন্তু ভাবনার স্থির দীপ্তি নেই। গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। তখনকার চলিত গানের সহিত এ-গুলির সাদৃশ্য আছে। ভাষাও ঐ জাতীয়। রবীন্দ্রনাথের—

'মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা'

গানের সঙ্গে রামবসুর

মনে রইল সই মনের বেদনা
প্রবাসে যখন যায় গো সে তারে
বলি বলি আর বলা হল না,

এবং 'ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে' গানের সঙ্গে শ্রীধর কথকের

'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।'

গানের ভাবে ও ভাষার সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। আর "প্রবাসে যখন…" গানটি তো নাটকোক্ত ট্র্যাজেডির মূল কারণ।

নলিনী বর্ণনামূলক করুণ-রসাত্মক নাটক। কাহিনী সামান্যই—অতি-পরিচিত বিরহ-মিলন-কথা। এর কাহিনীর সঙ্গে ভগ্ন-হৃদয় গীতি-কাব্যে প্রকাশিত কাহিনীর মিল আছে। স্থান বা কালের কোন স্পষ্ট পরিচয় বা দৃঢ়বদ্ধতা নেই—সবটাই কবির মানস-আকাশে কল্পনার রঙিন খেলামাত্র। কানন, উদ্যান, গৃহদেশ ও বিদেশ—এই হল স্থান পরিচয়। কাহিনী নিম্নে বর্ণনা করা গেল ঃ—

কবি-প্রকৃতি নীরদ নলিনীকে ভালবাসে, চপলহৃদয়া নলিনীও তাকে ভালবাসে কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। তার সামনে সে অভিভূত হয়ে পড়ে—"মুখে তার বাক্য নাহি সরে।" তার সযত্নে-তোলা ফুল আঁচল থেকে মাটিতে পড়ে যায়, অন্য সঙ্গী নবীন কিংবা সঙ্গিনী ফুলির সঙ্গে অকারণ আলাপে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে সে হৃদয়ের প্রবল প্রেমানুভূতিকে গোপন করতে প্রয়াস পায়। নীরদ কিছুই বুঝতে পারে না। অবশেষে নীরদ হৃদয়ের ভার সহ্য করতে না পেরে নলিনীকে প্রেম নিবেদন ক'রলে এবং তার মনোভাব জানতে চাইলে। নলিনী বিপদে পড়ল—কনিষ্ঠা ফুলিকে ডেকে অন্যকথা পাড়লে—পুষ্পচয়নের উদ্দেশে স্থানান্তরে গেল এবং একান্তে ধরা পড়ে স্তব্ধভাবে বসে পড়ল। শিথিল অঞ্চল-প্রান্ত থেকে ফুলগুলি মাটিতে ঝরে গেল। কিছুতেই সে মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে না। নীরদ তাকে বুঝতে না পেরে এবং সম্পূর্ণ ভুল বুঝে নৈরাশ্য-পীড়িত হৃদয়ে অভিমানে বিদেশ যাত্রা করলে। বিদায়ের মুহূর্তেও নলিনী মুখ খুলতে পারলে না। বিরলে বসে অশ্রুমোচন করতে লাগল—

'মনে রইল সই মনের বেদনা।'

'প্রবাসে যখন যায় গো সে তারে বলি বলি আর বলা হল না।' এমনই তার মনের অবস্থা, এবার ফুরাল তার সুখের দিন—দূর হ'ল তার চপলতা। বিরহ-বেদনায় দিনগুলি তার কালো হয়ে উঠল।

এদিকে নীরদ বিদেশে ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে নীরজার প্রেমে সান্ত্বনা খুঁজতে চাইলে এবং আশ্রয় পেলে। এই মেয়েটির চপলতা-বিহীন শান্ত প্রেম ও আত্মবিলুপ্তি তার ব্যথা কিছু পরিমানে দূর করে দিলে। তবে নলিনীকে সে ভুলতে পারলে না। সে-কথা নীরজার অজানা ছিল না। মেয়েটি সত্যই একটু অদ্ভুত। সে শুধু নীরদকে ভালবাসে নি, সে তার দুঃখে একান্ত ব্যাকুল হয়ে তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে যে সে নলিনীকে ভুল বুঝেছে, নলিনী মুখ ফুটে কোন কথা না বললেও তাকে ভালবাসে। এর থেকে বোঝা যায় যে মেয়েটি নীরদের কথা ভেবে আপনাকে ভুলতে চেয়েছে।

নীরজা—"কিন্তু সত্যি কথা বলি নীরদ, তোমরা পুরুষ মানুষেরা আমাদের ঠিক বুঝতে পার না। তুমি হয়ত জান না তার প্রাণের মধ্যে কি আছে। হয়ত সে তোমাকে ভালবাসে।"

নীরজার সঙ্গে বিবাহ স্থির হবার পরেও সে বিবাহ বন্ধ করতে চেয়েছে এবং নীরদের আগ্রহাতিশয্যে বিবাহে সম্মত হয়েও বলেছে—'যা হবার তা হবে, আমি তোমার সাথের সাথী রইলেম—ডুবি তো দুজনে মিলে ডুববো। যদি এমন দিন আসে তুমি আমাকে ভাল-বাসতে না পার; তোমার সঙ্গে আমার যদি বিচ্ছেদ হয়'—কথা শেষ করতে না দিয়ে নীরদ তাকে প্রেমের গভীরতা জানিয়েছে।

যাই হোক বিবাহ হয়ে গেল। নীরদ নীরজাকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরল। নলিনীদের বাড়িতে বসন্তোৎসব। তারা নিমন্ত্রিত হয়েছে। নীরজা যেতে অসম্মতি জানালে। কিন্তু গর্বিত নীরদ নলিনীকে দেখাতে চায় যে তাকে ভালবাসতে পারে এমন নারীও আছে। কিন্তু শীঘ্রই তার গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল। বসন্তোৎসবে তারা

যার সম্মুখীন হল সে চপলা নলিনী নয়—তার ছায়া-শীর্ণা, বিরহ-পরিক্ষীণা অভাগিনী নারী। সে অনুতাপে মরতে বসেছে। শৈশব-সঙ্গী নবীন আর ফুলি নীরদের ভুল ভেঙ্গে দিলে। এতদিনে নলিনীর মুখ ফুটেছে—সে নীরদকে সম্ভাষণ করেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল।

শেষ দৃশ্যে নীরজার মৃত্যুশয্যা রচিত হয়েছে—মুমূর্ষু নারী নলিনী ও নীরদের মিলন ঘটিয়ে চিরতরে পৃথিবী পরিত্যাগ করে গেল। নীরজার মৃত্যুশয্যায় নীরদ-নলিনীর মিলন-বাসর রচিত হল।

নাটকটি নানাকারণে অপরিপক্ক। কাহিনী সংগতিবিহীন, চরিত্র-সৃষ্টি অসার্থক, সংলাপে কবিত্ব থাকলেও নাটকীয়তা নেই। তবু এ-নাটকে যা আছে তার মূল্য কম নয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নারী-প্রকৃতির যে বিশেষ রূপ ধরা দিয়েছে এবং প্রেমের যে আদর্শ তাঁর ভাবনা ও ধারণার অনুকূল এই নাটকে তা প্রকাশিত হয়েছে। নারী—জায়া ও জননী। একদিকে সে পুরুষের কণ্ঠলগ্না ব্রীড়াময়ী বধূ অন্যদিকে সে সেবানিরতা জননী। একদিকে সে ভোগের ক্ষেত্রে পুরুষকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে—পুরুষ মোহাবিষ্ট হয়,

'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।'

রূপের পাত্রে সে বিষামৃত। পুরুষ তাকে কণ্ঠে ধারণ ক'রে আনন্দ-বেদনায় সংবিৎ হারায়। আত্মদান করে। আর অন্যদিকে এই নারী আত্মবিলুপ্তির তপস্যায় নিমগ্না, সে কল্যাণময়ী মাতা; নিপীড়িত করে রূপকে, নিগৃহীত করে যৌবনকে আর পুরুষকে টেনে আনে অমৃতের মহাসিন্ধুপানে। একদিকে সে প্রেয়সী উর্বশী অন্যদিকে শ্রেয়সী লক্ষ্মী। এক নারীর মধ্যেই এই দ্বৈত পাশাপাশি থাকতে পারে। যিনি জায়া তিনিই জননী। কালিদাসের কাব্যে নাটকে দেখি জায়ার জননী-পরিণামই নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। দুষ্মন্ত প্রিয়া শকুন্তলা ভরত-জননীরূপে নারীত্বের পূর্ণমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা আর শৈলসুতা কুমার-জননীরূপেই চিরধন্যা। একথা সত্য হলেও দেখা

গেছে যে কোন কোন নারীর মধ্যে—'জায়া' ভাবের প্রবলতা আবার কারও কারও মধ্যে মাতৃত্বই সমধিক প্রবল। এই দিক দিয়ে বিচার করলে সাধারণভাবে বলা যায় যে নারীর মধ্যে দুই প্রকারভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্র সৃষ্টিতে এই ভেদ-রেখাটি অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট। তাঁর 'মালঞ্চ,' 'দুইনারী' উপন্যাসে এর পূর্ণ ও পরিণত প্রকাশ ঘটলেও প্রথম যুগের নাট্য 'নলিনীতে' বীজাকারে এই সূত্রটি চোখে পড়ে। নলিনী প্রিয়া-জাতীয়া আর নীরজা মাতৃজাতীয়া।

দ্বিতীয়তঃ *প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এই নাটকেও প্রকাশিত হ'তে দেখি। প্রেম দুঃখ বেদনার মধ্যে দিয়ে তপস্যানলে পূত হয়েই আপন সার্থক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধারণায় কালিদাসের প্রভাব লক্ষিত হ'লেও এইটেই প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চরম কথা। কামনার স্তর অতিক্রম করতে পারলেই প্রেমিক আকাংক্ষিত আনন্দধামে পৌঁছতে পারে। এই নাটকে নীরজা প্রেমাস্পদের সুখের জন্য নিঃশেষে আপনাকে দান ক'রে ত্যাগের মহিমায় প্রেমকে হোমশিখার মতো উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। আবার বেদনার দাহের মধ্যেই নলিনী প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেছে।

এইরূপে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনা (১৮৮১—১৮৮৪) এই তিনটি নাটকে তাঁর বহু মনন ও কল্পনার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথ-আলোচনায় এ-গুলির প্রয়োজনীয়তা কম নয়।

*'তপতী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকার একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। এর যে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পগত উৎকর্ষ আছে তা নয়, তবে এর মধ্যে বিশ্ব-বিধানের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যের মূল কথা। গ্রন্থখানি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে রচিত হয় কিন্তু এই গ্রন্থের মূল সুরটি রবীন্দ্রচিত্তে এমন ভাবেই জাগ্রত ছিল যে তিনি পরবর্তীকালে কয়েকবার এর কথা উল্লেখ করেছেন। 'রাজা ও রানী'-নাটকের ভূমিকায় এর উল্লেখ আছে—"প্রকৃতির প্রতিশোধের" সঙ্গে 'রাজা ও রানী'র এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লংঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে।" ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'মালিনী' রচিত হয়। তার ভূমিকাতেও 'প্রকৃতির পরিশোধ' এর কথা উল্লিখিত হতে দেখি অর্থাৎ পরিণত বয়সেও তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র মূল কথাটি ভুলতে পারেননি, যেমন পারেননি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র কথা। ব্যাপারটি এমনই গুরুতর, অতএব বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যচিন্তায় Nemesis শব্দটি প্রকৃতির প্রতিশোধ অর্থেই ব্যবহৃত—"Broadly speaking, Nemesis is retribution as it appears in the world of art. In ancient thought Nemesis was an artistic bond between excess and reaction." অবশ্য পরবর্তীকালে এই অর্থ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। আত্যন্তিকতার ভীষণ প্রতিক্রিয়া—এই সাধারণ অর্থে সর্বদেশের সর্বকালের কাহিনীমূলক বা ঘটনামূলক কাব্যে বা নাটকে Nemesis এর সত্যটি গৃহীত। অবশ্য Nemesis যে বিশ্ব-বিধানের অন্তর্নিহিত পরম সত্য—এ-কথা অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্যকেই জীবনের শ্রেয়ঃ পন্থা বলে মনে করেন। তিনিও প্রকৃতির প্রতিশোধ—কথাটি মূলতঃ একই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যাই হোক এ-সম্বন্ধে তাঁর কথা উদ্ধৃত করছি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্য-কাব্য সম্বন্ধে তিনি জীবন-স্মৃতিতে বলেছেন,

"এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন, মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখন যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।"

অথবা

"প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোন মতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে যখন সন্ন্যাসীর মিলন ঘটিল তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।"

এই উক্তিসমূহ থেকে এই কথাই বুঝতে পারা যায় যে নিবৃত্তি-মার্গগামী সন্ন্যাসী শেষ পর্যন্ত স্নেহপাশে ধরা না দিয়ে পারেন নি অর্থাৎ প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে। অসীম-বোধের আত্যন্তিকতার প্রতিক্রিয়ারূপে জাগ্রত হয়েছে অসহায়া রঘুর দুহিতার প্রতি অপরূপ স্নেহ। Nemesis এর ভীষণ প্রতিক্রিয়া যা পাশ্চাত্ত্য নাটকে রূপায়িত রবীন্দ্রনাথে তার অত্যুগ্র প্রকাশ অবশ্য নেই তবে একটু

স্বতন্ত্রভাবে হলেও মূলনীতির স্বীকৃতি আছে এ-কথা সহজেই বলা চলে।

তা ছাড়া এখানে রবীন্দ্র-জীবন-বোধের সত্য পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একান্ত ভোগ বা একান্ত ত্যাগ কোনটাকেই সার্থক পথ বলে স্বীকার করেন নি। যে-কোনটির আত্যন্তিকতা শ্রেয়োবোধের বিরোধী বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। 'আত্মপরিচয়ে' বলেছেন, "যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি তারা পারে যাবে কী করে। সেইজন্যই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। 'গময়'—এই কথার মানে এই যে পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার যো নেই।" আবার 'তপোবন' প্রবন্ধে বলেছেন, "ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায় আবার সতী যখন তাঁর পিতৃ-ভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।"*

আসল কথাটা কী? রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য জীবনকেই শ্রেয়ঃ পন্থা বলে মনে করেন, যেখানে ভোগের সঙ্গে ত্যাগ রয়েছে মিলিত। 'রাজা ও রানী' নাটকের বিক্রম একান্ত ভোগের পথে চলেছিলেন ঘটল তাঁর সর্বনাশ আর 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী ত্যাগের পথ থেকে বিরত হয়ে স্নেহমমতার মধ্যে সংসারে শ্রেয়ের সন্ধান পেলেন। ত্যাগ ও ভোগ এই দুই কোটিতে জীবনের সার্থকতা—পূর্ণশক্তি।

উপনিষদের ঋষি বলেছেন,

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে।
> ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ!

'যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা যাহারা কেবল মাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।'*

---

*তপোবন—শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড। *ততঃ কিম্—ধর্ম।

অর্থাৎ কোন একটি পথেই শ্রেয়ঃকে লাভ করা যাবে না, দুটিকে মিলিয়ে নিতে হবে। প্রবৃত্তির পথেই নিবৃত্তিতে পৌঁছতে হবে, তবেই পরিপূর্ণতা। কোন একটির একান্ত প্রবণতার স্থান এখানে নেই।

বিশ্ববিধানে দেখি কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ শক্তি মিলিত হয়ে সৃষ্টিকে সম্ভব করেছে—একটির আত্যন্তিকতা সৃষ্টিপ্রবাহে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয়। জীবনের ক্ষেত্রেও তাই, এমন কি শিল্পরচনার ক্ষেত্রেও এ-কথা সত্য। বাস্তব ও কল্পনার মিলিত ছন্দেই শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

আজ পর্যন্ত জীবনে বোধ করি তিনটি পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। জীবনকে একান্তভাবে গ্রহণ করা অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গ, দ্বিতীয়টি প্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধন,—নিবৃত্তি মার্গ বা সন্ন্যাস আর তৃতীয়টি হচ্ছে আর্যধর্মানুমোদিত গার্হস্থ্যধর্মের পথে যেখানে সংসার ও সংসারেশ্বরকে মিলিয়ে নিয়ে জীবনের পূর্ণ সমারোহ। ঋষিরাও তপোবনে গৃহীর জীবন যাপন করতেন—প্রীতি ও স্নেহের সঙ্গে কঠোর তপশ্চর্যা মিলিত হয়ে জীবনকে সহজ পথে পূর্ণ পরিণামে পৌঁছে দিত। রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত পথকেই সমর্থন করেছেন তাই তাঁর শেষ কথা, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' তথা সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে এ-সত্য বিরাজিত।*

*'কাব্য হিসাবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র স্থান কী তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ; এই একটি মাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানাবেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।'

প্রকৃতির প্রতিশোধ—জীবনস্মৃতি।

রবীন্দ্র-ট্র্যাজেডির স্বরূপ লক্ষণ

রবীন্দ্রনাথকে কবি সার্বভৌম বলা হয়েছে। কথাটি প্রণিধান-যোগ্য। বাংলাসাহিত্যের মানদণ্ডের মত পূর্বাপর সমগ্র সাহিত্য-ভূমি পরিব্যাপ্ত ক'রে অভ্রভেদী তাঁর মহিমা। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, প্রবন্ধে, ভ্রমণকাহিনীতে, জীবনীসাহিত্যে, পত্রসাহিত্যে এবং সঙ্গীতরচনায়—সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিভাগে তিনি পরমতম সিদ্ধি লাভ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর নাট্যসাহিত্যের বিশেষতঃ ট্র্যাজেডির আলোচনা করতে চেষ্টা ক'রব। এক্ষেত্রে তার সর্বাবয়ব আলোচনা করার দুঃসাহস আমার নেই। কয়েকটি ট্র্যাজেডিকে নিয়েই প্রধানতঃ এ আলোচনা চলবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে অথবা একই সময়ে বিভিন্ন ধরণের ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন; তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা নাট্যীকৃত হয়েছে। একই কাহিনী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আংগিকে বা রূপে প্রকাশিত হয়েছে, এমন কি তাঁর চিন্তাধারা যা তত্ত্বমূলক এবং নানাভাবে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হতে পারতো তারও নাট্যীকৃত রূপ আছে। এই আংগিকের বা রূপের পরিবর্তন বিচিত্রভাবে ঘটেছে। কোন বিশেষ আংগিক বা রূপকে তিনি নাটকের পরম বা একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলে মেনে নেন নি। কখনও তিনি নাটকের সনাতনী রীতিকে আশ্রয় করেছেন, কখনও তাকে অতিক্রম করেছেন আবার কখনও বা নূতন রীতির প্রবর্তন করেছেন। তাঁর নাটকে গ্রীক ক্ল্যাসিকাল্ ট্র্যাজেডির অতিসংক্ষিপ্ত দৃঢ়বদ্ধতা, নিয়তিনিষ্পেষণ, রোমান্টিক ট্র্যাজেডির বহুশাখায়িত বিস্তার, 'চরিত্রই নিয়তি'-নীতি, সংস্কৃত-নাট্যকলার কাব্যৈশ্বর্য, চরিত্র এবং যাত্রা ও কথকতার অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর নাটক বিশুদ্ধ গদ্যে, ছন্দোময় গদ্যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে, কাব্যে, সংগীতে এমনকি নৃত্যছন্দে প্রকাশিত হয়েছে।

নৃত্যনাট্যই তাঁর নাটকীয় প্রতিভার শেষ পরিণতি। অনেকে মনে করেন যে তাঁর গীতিধর্মিতা বস্তুভার বর্জনের পথে তাঁকে এই পরিণামে এনেছে যেখানে বস্তুভার নেই, আছে শুধু ভাব ও ভঙ্গিমাসর্বস্ব নৃত্যময় দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা। কথাটা ভেবে দেখবার মত। তবে আমাদের বিশ্বাস আছে যে কবিগুরু আরো কিছুদিন জীবিত থাকলে হয়তো এ স্তরটিকেও অতিক্রম করে ছায়ানৃত্যলোকে প্রবেশ করতেন যেখানে নৃত্যের কায়াহীন ছায়াভঙ্গিমাই রূপে রসে টলমল করে উঠতো, যেখানে সম্ভব হ'তো ছায়ার মধ্যেই কায়ার অপরূপ বিকাশ।

যাক্ সে কথা। সকল প্রকার আংগিকেই তিনি ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন। এই বিভিন্ন স্তরের বা বিভিন্ন সময়ের ট্যাজেডিসমূহ আলোচনা করলে তাঁর ট্র্যাজেডির মূল সুরটি ধরা যায়। এই প্রসংগে মুকুট, বিসর্জন, রাজা ও রানী, তপতী, মুক্তধারা ও রক্তকরবী, নটীর পূজা ও শ্যামা আলোচনা করব। আপাতদৃষ্টিতে এই তালিকার বৈসাদৃশ্য বেশী করেই চোখে পড়ে। তাদের আংগিকগত এবং রূপগত পার্থক্য এত বেশী যে তাদের যে একই ধারার অন্তর্গত করে আলোচনা করা চলে, একথা যেন ভাবতেই পারা যায় না। তবু একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে এরা যে ঐক্যসূত্রে বিধৃত তা সন্ধানী পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না।

সূচনাতে একটি কথা সেরে রাখা ভালো। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভার দ্বিবিধ লক্ষণ দেখা যায়।* অন্য উপযুক্ত নামের অভাবে একটিকে আত্মনিষ্ঠ এবং অন্যটিকে বস্তুনিষ্ঠ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, অথবা একটিকে গীতিধর্মী বা লিরিক এবং অপরটিকে নাটকীয় বা ড্রামাটিক বলতে পারি। প্রথমক্ষেত্রে বিশ্বসত্তা কবির আত্মসত্তায় বিলীন হয়ে যায়। জগৎকে নয়, জাগতিক বস্তুর মাধ্যমে কবি আপনাকেই প্রকাশ করেন; বস্তুবিশ্বের যেন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তা কবির অন্তরের

*এই বিভাগ বিশেষ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। বলা বাহুল্য কোনটিই সম্পূর্ণরূপে অন্য নিরপেক্ষ নয়।

বিশিষ্ট রংএ, রেখায় এবং লাবণ্যে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়। 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' কবি জগৎকে নূতন করে সৃষ্টি করেন। এখানে কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই সমধিক প্রবল। এই ধরণের প্রতিভাকে গীতিধর্মী বা লিরিক অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ প্রতিভা বলতে পারি। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে কবি কিন্তু বস্তুবিশ্বে আপনাকে নিঃশেষে বিলীন করে দিয়ে তারই যথাযথ রূপ উপস্থাপিত করেন। এখানে 'আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ'। এখানে কবির নিজের সত্তা বলে যেন কিছু নেই। তিনি বিশ্বানুভূঃ, বিশ্বের তাবৎ পদার্থের মধ্যে আপনাকে বিলীন করে দিয়ে তাবৎ পদার্থের রূপ গ্রহণ করেন। কবির মহান আত্মবিলোপ ঘটে। অগ্নি যেমন দাহ্য পদার্থের রূপে আপনাকে প্রকাশ করে এ যেন তাই-ই। এই প্রতিভা নির্বিশেষ-সত্তা প্রকৃতির প্রাণশক্তির সহিত তুলনীয় হতে পারে, সেখানে প্রকৃতির কোন একটি বিশিষ্টরূপ দেখে প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। বিচিত্ররূপা প্রকৃতির নদী, সমুদ্র, পর্বত, তরুলতা, চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা প্রত্যেকটি একই শক্তির বিকাশ হলেও নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান প্রত্যেকই অদ্বিতীয়। প্রত্যেকে তার স্বতন্ত্র মহিমায় প্রকাশিত, কোন একটি বিশিষ্ট মহিমালোকে সমাচ্ছন্ন নয়। এই ধরণের প্রতিভাকে বলা হয় বস্তুনিষ্ঠ বা ড্রামাটিক। প্রথমটিতে জ্ঞাতার প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে জ্ঞেয় আপন রূপে প্রকাশিত। ব্যাস, বাল্মীকি, সেক্স্পীয়র, হোমর এই প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম অধিকারী, আর কালিদাস, দান্তে মিলটন, শেলী, ওয়ার্ডস্বার্থ প্রভৃতি কবিবৃন্দ প্রথমোক্ত শক্তির অধিকারী। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এই প্রথমোক্ত প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকারী। এই শ্রেণীর কবিগণের একটি বিশিষ্ট জীবনবোধ বা বাণী (message) থাকে। তাঁদের যে কোন একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আলোচনা করলে আমরা তাঁদের বাণী (message) উপলব্ধি করতে পারি। এখানে কাব্য কবিজীবনেরই প্রকাশ কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কবিকে তাঁর কাব্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কবির শিল্পিসত্তা এবং তাঁর মানবসত্তার মধ্যে যোগাযোগ এতই ক্ষীণ যে তাঁর কাব্য থেকে কবি মানুষটিকে সন্ধান করে বার করা সম্ভব নয়। কবি সদসৎ-নির্বিশেষে সকল বস্তুর প্রতি সমান সহানুভূতিশীল। ভালোমন্দ বিচার না করে প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে যা গড়ে উঠেছে তারই যথাযথ রূপ তিনি প্রকাশ করে চলেছেন। পূর্বেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে ও প্রবন্ধে একটি বিশেষ জীবনবোধের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে এই জীবনবোধ সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়বেই। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধেও সাধারণভাবে একথা সত্য। অনেক ক্ষেত্রে নাটকের ভূমিকায় বা স্বকীয় আলোচনায় কোন একটি বিশেষ জীবনসত্যের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। অবশ্য একান্ত সচেতনভাবে তিনি যে সেটি করেছেন তা হয়তো সবসময় বলা যাবে না। হয়তো কিছুটা অজ্ঞাতসারেই তা ঘটেছে। তবু তা ঘটেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এক্ষণে উপরি উক্ত নাটকগুলি থেকে রবীন্দ্র ট্র্যাজেডির সামান্য লক্ষণ এবং তাদের মধ্যে দিয়ে যে জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে তার আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে মৃত্যুর ভয়াবহতার মধ্যে রবীন্দ্র-ট্র্যাজেডির পরিসমাপ্তি ঘটছে না এবং ট্র্যাজেডির যিনি নায়ক তাঁরও মৃত্যু ঘটছে না। দ্বিতীয়তঃ ট্র্যাজেডির পরিণামে পাপের (পাপীর নয়) বিনাশ ঘটছে এবং তার জন্য যিনি আত্মোৎসর্গ করছেন তিনি নিষ্পাপ এবং নির্দোষ। তৃতীয়তঃ এমনি করে নিঃশেষে প্রাণ বলি দেওয়ার ফলে পাপীর হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে এবং তিনি পাপ ও মোহমুক্ত হয়ে জীবনের সত্যধর্ম উপলব্ধি করেছেন।

প্রথম লক্ষণটির আলোচনা করা যাক। 'বিসর্জন'* নাটকে

*'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী' নাটকদ্বয় এক সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে 'বিসর্জন' পূর্বে আলোচিত হল।

জয়সিংহের মৃত্যুর দৃশ্যে নাটকের চরম পরিণাম (catastrophe) ঘটে গেল। এর পরে নাটকের কাহিনীর প্রয়োজন থাকতে পারে তবে তার নাটকীয় প্রয়োজন বোধ করি অনেক খানি স্তিমিত হয়ে আসে। পঞ্চম অংকের প্রথম দৃশ্যে রাজরক্ত নিবেদনের ছলে জয়সিংহ আপনাকে উৎসর্গ করলেন। রঘুপতির নিষ্ঠুর আত্মম্ভরিতা ও অবিমৃষ্য-কারিতা এবং প্রচণ্ড অহংবোধের অনিবার্য পরিণাম ঘটে গেল। জয়সিংহের মৃত্যু যেমন একদিকে দর্শকচিত্তকে বেদনায় মুহ্যমান করে তেমনই রঘুপতির এই সর্বস্ব-হারানোর চরম দুঃখ-পরিণামকে উপযুক্ত বলেই গ্রহণ করে। কিন্তু নাটক এইখানে শেষ হয় নি। তার পরে আরও তিনটি দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। জয়সিংহের মৃত্যু ব্যর্থ হয় নি। তাঁর মৃত্যুতে রঘুপতি সত্যধর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছেন, রানী গুণবতীর পক্ষেও প্রেমের যথার্থ মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে। 'পিতা চলে এস'—অমৃতময়ী অপর্ণার সুধামাখা কণ্ঠে শান্তির ললিত বাণী উচ্চারিত হয়েছে। নাটকের দিক থেকে প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও জীবনের দিক থেকে যে এর প্রয়োজনীয়তা আছে তা বোধ করি স্বীকার না করে উপায় নেই। এখানে মৃত্যু ভেদ করে অমৃত পড়েছে ঝরে, নিদারুণ দুঃখরাতের শেষে দেখা দিয়েছে দেবতার মহিমা। জয়সিংহের মৃত্যুর পরেও রঘুপতির জীবন অর্থহীন হয়ে যায় নি। তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছে। দুঃখের প্রচণ্ড আঘাতেই তিনি জীবনের সত্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। অপর্ণা তাঁকে শান্তির মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

'রাজা ও রানী' নাটকের উপসংহারে বিক্রমদেবের উক্তিতে যে অনুতাপ প্রকাশিত—যে অশ্রুধারা ঝরে পড়েছে—

"রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে? ইহজন্মে
নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?"

তার মধ্যে ব্যর্থতার কথাই (terrible waste) একান্ত হয়ে ওঠে নি। যে সুমিত্রাকে লাভ করবার জন্য তাঁর এই বিপুল আয়োজন, দুর্ধর্ষ প্রচণ্ড সংগ্রাম, লোকনির্যাতন ও মহাদুঃখবরণ তাঁর মৃত্যুতেও রাজার জীবন অর্থহীন হয়ে গেল না। নিত্যবেদনার অশ্রুজলে, প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে খুঁজে পেলেন সুমিত্রার সত্য—জীবনের সার্থকতা।* 'তপতী'র নাটকীয় উৎকর্ষ অসাধারণ। বিক্রমদেব বেদনার অপ্রত্যাশিত রূঢ় ভয়ংকর আঘাতে পাষাণে পরিণত হয়েছেন, তিনি মহাবিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। তবুও বুঝতে পারা যায় যে বিক্রমদেবের পক্ষে সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে এবং তার জন্য মার্তণ্ডদেবের চরণে সুমিত্রার এই পরম আত্মনিবেদনের প্রয়োজন ছিল। সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে তার সমাধা হল। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি সুমিত্রাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার পথে ছিল বাধা সুমিত্রার মৃত্যুতে ঘটল তার অবসান এবং এই শান্তির মধ্যেই বিক্রম সুমিত্রার প্রেমের সত্য উপলব্ধি করলেন। দেবী সুমিত্রা এই মোহমুক্তির জন্যই বিক্রমকে মার্তণ্ড-মন্দিরে আহ্বান জানিয়েছেন :—

সুমিত্রা—'আসুন এখানেই, নইলেই তাঁর মুক্তি কিছুতেই হবে না। আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে। তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাবো।'

তাই সুমিত্রার মৃত্যুতে ব্যর্থতার দিক চোখে পড়ে না। নেপথ্য থেকে বেদমন্ত্রধ্বনি ভেসে আসে,

> অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য
> নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ ॥
> পৃথিবীশান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যোঃ শান্তিঃ
> শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হিরণ্যরুচি হোমাগ্নিশিখার দীপ্তোজ্জ্বল আভাস সূচিত হয়, কল্পনা

*সম্পূর্ণ নিষ্পাপচিত্ত কুমার সেনের মৃত্যুবরণও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

করতে পারা যায় হোমারুণ-আঁখি অগ্নিস্নান-শুচি-দেহা তাপসিনী দেবীমূর্তি। মৃত্যু যেন এখানে তার ভয়ংকর মূর্তি হারিয়ে ফেলেছে। মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে চিতাগ্নি-শিখাকে উজ্জ্বলতর ক'রে যেন মানবাত্মার পরম সত্যবাণী উচ্চারিত হয়েছে,

মৃত্যু কোথা? দুঃখ কিছু নাহি
বিশ্বের আকাশ ভরি' মুক্তির আনন্দ আসে নামি।

'নটীর পূজা'য় রাজাদেশে শ্রীমতী অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমায় ভগবান বুদ্ধের আরতি করলেন, করলেন আত্মনিবেদন :

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

নেমে এল উদ্যতখড়্গ রাজরোষ, ঘটল তার মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুই কি এই নাটকের চরম কথা? যাঁরা এই নাটকের অভিনয় দেখছেন তাঁরা কিন্তু জানেন যে মৃত্যু এখানে তুচ্ছ, অবান্তর হয়ে যায়। মৃত্যুর ভয়াবহতার ঊর্ধ্বে আরতি-নৃত্যপরা পাবকশিখারূপিণী শ্রীমতীর মূর্তিখানিই সারা মন জুড়ে বিরাজ করতে থাকে। একেই বলে মৃত্যুর অমৃত পরিণাম। তারপরে দেখা যায় এ মৃত্যু ব্যর্থ হয় নি, রাজকুমারী রত্না সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়ে শ্রীমতীর চরণে লুটিয়ে পড়েন, রাজা অজাতশত্রু বহন করে আনেন ভগবানের পূজা—ভগবান বুদ্ধের মহিমা নূতন করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'রক্তকরবী'র শেষে মহাবিপ্লবের সূচনা। রাজা সত্য উপলব্ধি করে 'প্রলয়পথে দীপশিখা', নন্দিনীর হাত ধরে চরম ভাঙা ভাঙতে বেরিয়েছেন। রঞ্জন মৃত্যু বরণ করেছেন ; কিশোর বুদ্বুদের মত লুপ্ত হয়ে গেছে। কিশোরের স্পর্ধিত ঔদ্ধত্য রাজা সহ্য করতে পারেন নি। এই ভয়ংকর বিপর্যয়ের গর্জায়মান প্রলয়াগ্নিশিখার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নন্দিনীর আশ্বাসবাণী শোনা যায়, 'মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনো মরতে পারে না।' একলা মহাযাত্রার পথে বিশু শুনতে পায় ধরণীর বুক জুড়ে চিরন্তন মহাসঙ্গীত উঠছে,

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে
আয়, আয়, আয়।
ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি, হায় হায় হায়।

প্রলয়বহ্নিশিখায় নব নব সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ সৃষ্টির মহাকাশ চোখে পড়ে। 'মুক্তধারা' নাটকে নৃপতির কথার উত্তরে সঞ্জয় বলেছেন, 'ঐ বাঁধের একটা ক্রটির সন্ধান কি করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।' মৃত্যুর ভয়ংকরতা এখানে মাতৃমূর্তি ধারণ করে তাঁকে কোলে তুলে নিল। তারপরে গণেশ যখন প্রশ্ন করেছে, 'যুবরাজকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তা হলে তাঁকে কি আর পাব না?' এর উত্তরে পাই ধনঞ্জয় বৈরাগী অদ্ভুত উক্তি, 'চিরকালের মত পেয়ে গেলি।' শোনা যায় ভৈরবপন্থীর গান। ক্ষণকালের মৃত্যুর বৃন্তে চিরকালের জীবনশতদল ফুটে ওঠে। প্রাণ উৎসর্গ করেই প্রাণ আপনাকে শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। রণজিতের রাজ-অভিমান ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা এখানে কবিত্বের শেষতম এবং সাধ্যতম চূড়া স্পর্শ করে আর্টের চিরন্তন মহিমায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। দেবরাজের অমৃতপান সভায় উর্বশীনৃত্য-ঝংকারিত দেবনাট্যের কল্পনা করেছি কিন্তু 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে যে অপরূপ রূপ বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখেছি তার সুদূরতম আভাসও সে কল্পনায় আনতে পারি নি। অনবদ্য কাহিনীতে, চরিত্রচিত্রণে এবং বেদনা-করুণ-পরিণাম সৃজনে এ নাটক তুলনা-বিরহিত। এই নাটকেই রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ সংগীতটি আছে,

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই ; তুমি জান নাই
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।............

মৃত্যুপথযাত্রী তরুণ উত্তীয়ের মুখে এই অপূর্ব সংগীত ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়। প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমাস্পদের জন্য মৃত্যুও অমৃতমাধুরীতে পরিপূর্ণ।

'মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে।'

শিল্প-সমুদ্র-মন্থন-করা দেব-অমৃত এই নাটক। মর্ত্যের মাধুরী এবং স্বর্গের অলৌকিক সুষমাকে এ যেন একত্রে বেঁধে দিয়েছে। চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত টলমল করছে আর তাকে ঘিরে ঘনিয়ে এসেছে মৃত্যু ও বিচ্ছেদের রূঢ়তম আঘাতের ঘনকৃষ্ণ করাল-মূর্তি—কি নিদারুণ পরিণাম। বেদনার তীব্র আঘাতে হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি 'পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া' শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রচণ্ড ব্যর্থতার মহাস্তব্ধতা হৃদয়কে স্তম্ভিত ও মুহ্যমান করে ফেলে। শ্যামা বিদায় নিয়ে চলে যায়। তার পরম সার্থকতা মুহূর্তেই চরম ব্যর্থতায় পরিণত হয়। চলে না চরণযুগ—তবু যেতে হবে। কোথায় ? কে বলবে কোথায় ? গৃহহারা, সর্বস্বহারা, পাপ ও প্রেমভারে জর্জরিতা নারী কোন মহাশূন্যতার গহ্বরের দিকে ফিরে চলে। অনন্ত পুণ্য, অন্তহীন পাপে ভরা এ কোন মহান চিত্র। শ্যামার মনের এ অবস্থা সম্পূর্ণভাবে অনুভব পর্য্যন্ত করা যায় না। উত্তীয়ের ট্র্যাজেডি করুণ কিন্তু এও সত্য যে মৃত্যুতে সে জীবনের পূর্ণপাত্র পান করেছিল—বজ্রসেনের ট্র্যাজেডি করুণতর আর শ্যামার পরিণাম করুণতম। কিন্তু নাটক এইখানেই শেষ হয় নি। নাটকীয় চরম মুহূর্তের তীক্ষ্ণতম চূড়ায় হতাশায় শোকে বেদনায় চিত্ত যখন তীব্রভাবে দোল খেতে থাকে তখন সেই বিপর্যয়ের মাঝে পাপীজন-শরণ প্রভুর কাছে বজ্রসেনের আর্তস্বর—আকূতি ও কাতর প্রার্থনা, উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে—

'জানিগো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।'

দুর্যোগের প্রান্তে ক্ষীণ কিন্তু একান্ত সত্য আলোকরেখার মতই সান্ত্বনার একটি অশ্রুসজল আভাস সূচিত হয়। সকল ব্যর্থতা যেন সার্থকতায় ভরে ওঠে।

ক্ষুদ্র নাটিকা 'মুকুটের' মধ্যেও দেখা যায় যে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার চন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু-শয্যায় দুর্বৃত্ত রাজধরের পরিবর্তন ঘটেছে। তার অপরাধের সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত করেছেন চন্দ্রমাণিক্য, কিন্তু তাঁর এই মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি। প্রাণ দিয়ে তিনি প্রাণকেই জাগিয়েছেন। রাজধর মনুষ্যত্বের মহিমা উপলব্ধি করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমি রবীন্দ্র ট্র্যাজেডির যে সামান্য লক্ষণগুলি নির্দেশ করেছি তাদের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

*এই প্রসংগ বিশ্ববিধান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। বিশ্ববিধানের কোথাও তিনি কোন খণ্ডতাকে পরমসত্য বলে স্বীকার করেন নি। বস্তুতঃ উপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট তাঁর হৃদয় খণ্ডসত্যকে বিশ্বাস করতেই পারে নি। আপাতদৃষ্টিতে যা খণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন মনে হয় তা বৃহত্তর তাৎপর্যের—বিকাশের অভিমুখে। কোথাও না কোথাও তার সম্পূর্ণতা আছে।

'আমার অনাহত আমার অনাগত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা।'

জীবনে খণ্ডতা আছে, দুঃখ আছে, আছে মৃত্যু কিন্তু দুঃখমৃত্যু পরিণাম নেই। সমস্ত দুঃখ খণ্ডতা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক চৈতন্যময় পুরুষ মানবেতিহাসকে এক মহৎ ও বৃহৎ তাৎপর্যের অভিমুখে বহন করে নিয়ে চলেছেন। খণ্ডতা পূর্ণদৃষ্টির অভাবে খণ্ডতা, মৃত্যু খণ্ডিত

---

*'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্ববিধানের স্বরূপ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জীবনবোধে ভয়ংকর। বিশ্ববিধানের আনন্দময় পরিণামে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ান্তি অভিসংবিশন্তীতি'—উপনিষদের এই সত্যবাণী। তিনি মানবের অমৃত সত্তায় বিশ্বাস করতেন। দুঃখ মৃত্যুকে অতিক্রম করে তাদের ঊর্ধ্বে যে মানবজীবন—এ কথা তাঁর কাছে বাস্তব সত্য। এই উপলব্ধি তাঁর বহু কবিতায়, বহু প্রবন্ধে, বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অধিক আলোচনা বাহুল্যমাত্র। পূর্ণ এবং অখণ্ড বিধানের রূপ তাঁর কাছে একান্ত সত্য বলেই তাঁর ট্র্যাজেডিতে দুঃখই চরম হয়ে ওঠেনি—তা মৃত্যুকে পেরিয়ে গেছে।

আমাদের আলোচনা থেকে আর একটি কথাও সুস্পষ্ট হবে। নায়ক পাপী বা দুর্বৃত্ত হলেও উপসংহারে তার মৃত্যু ঘটে না। রঘুপতি, বিক্রমদেব, রক্তকরবীর রাজা, যন্ত্ররাজ বিভূতি, রাজধর, শ্যামা এঁদের কারও দৈহিক মৃত্যু ঘটেনি। সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির সঙ্গে রবীন্দ্র ট্র্যাজেডির ওই ব্যাপারে একটা মস্তবড়ো পার্থক্য রয়েছে। সেখানে নায়ক বা প্রতিনায়কের মৃত্যু অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। শেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর অন্যায় বা পাপ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন কিন্তু এই সচেতনতা তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি। পাপের বা অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত চরমদণ্ড মৃত্যুর মাঝ দিয়েই তাঁকে করতে হয়েছে। তাঁর অন্যায় পাপে বিচলিত বিশ্ববিধান উত্তাল ফেনিল তরংগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ধ্বংসের প্রচণ্ডতায় ভেঙে পড়েছে। পরিণামে নেমে এসেছে দারুণ করুণ মৃত্যু—প্রলয় বহ্নিতেই হয়েছে চরম মার্জনা। পাপীর এই ভয়ঙ্কর নিদারুণ মৃত্যুপরিণাম সেক্সপীয়রের নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ।

'বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে-একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধা বিঘ্ন ভেদ করে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন এখানে তাঁরই কথা দেখি।'

আত্মপরিচয়।

সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি...............
....
বিদ্বেষের ভীষণা নিবৃত্তি
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

এই পরিণাম মর্মান্তিক দুঃখদায়ী সত্য—পাঠকের মন এতে ভীতি, বেদনা এবং সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হয় কিন্তু তার ন্যায়বোধও পরিতৃপ্ত হয়। অবশ্য ন্যায়বোধের কথায় এখানে ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়-নীতির (Poetic justice) কথা বলছি না, কারণ এই নীতি বাস্তব-সত্যের বিরোধী। পাপের বা অন্যায়ের পরাজয় এবং পুণ্য বা ধর্মের জয় ঘটবেই এমন কোন কথা নেই। বস্তুতঃ বাস্তবজগতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমটাই চোখে পড়ে। তবে কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে পাপের পরাজয় প্রায়শঃই ঘটতে দেখা যায় কিন্তু পুণ্যের জয় কি সর্বদা ঘটে? অবশ্য কোন পারলৌকিক জয়ের কথা বলা হচ্ছে না। কুন্দনন্দিনী, দলনী বেগম, 'পল্লীসমাজে'র রমা কি পাপ করেছিল যার ফলে তাঁদের মৃত্যুবরণ করতে অথবা মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে? জয়সিংহ, কুমারসেন ও ইলা কার অপরাধে জীবনে মৃত্যু অথবা চরম দুঃখের সম্মুখীন হয়েছেন? অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি রচয়িতা সেক্সপীয়র থেকে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমরা লীয়র, ম্যাকবেথ বা ওথেলো-এর অপরাধের কথা বুঝতে পারি কিন্তু ওফিলিয়া, দেসদেমোনা বা কর্ডিলিয়া কী এমন পাপ করেছিলেন যার জন্য তাঁদের এই নির্মম মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হ'ল? বস্তুতঃ কোন পাপই তাঁরা করেন নি। দ্বিতীয়তঃ ম্যাকবেথ, ইয়াগো বা এডমণ্ড্-এর তুলনায় ওথেলো বা লীয়র-এর অন্যায় কতটুকু? কিন্তু তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত কি সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করেনি? লঘুপাপে তাঁদের কি গুরুদণ্ড ভোগ করতে হয়নি। কাজেই পাপ-পুণ্য তৌল করে শাস্তি বা পুরস্কার—

নীতি-বাগীশের এই কৃত্রিম ধারণা বাস্তব জগতে ত নয়ই শিল্পজগতেও সর্বদা প্রয়োজ্য নয়। তবে এইটুকু বলা যায় যে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত দেখলে আমাদের ন্যায়বোধ পরিতৃপ্ত হয়। নাট্য-সাহিত্যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া (Nemesis) প্রায়ই দেখা গেছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকেও এই প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু পাপীর দৈহিক মৃত্যু-পরিণাম নেই। এইখানে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে দৈহিক মৃত্যুই কি অন্যায়ের চরম শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত? মৃত্যুর অধিক শাস্তি কি নেই? অর্থহীন দুর্ভর জীবনযাপন করা কি কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত নয়? জয়সিংহ বা সুমিত্রার মৃত্যুর পরে রঘুপতি বা বিক্রমের জীবনের অর্থ কী? আমৃত্যু অনুশোচনার অশ্রুজলেই কি তাঁদের জীবনবহ্নি নির্বাপিত হয়নি? এই পরিণাম কি মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ংকরতর নয়? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তো সব শেষ হয়ে যায়—এ যে জীবনে অগ্নিশয্যা। এই উক্তির মধ্যে কথঞ্চিৎ সত্যতা থাকলেও পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন যে রঘুপতি ও বিক্রমদেব চরম দুঃখের মূল্য দিয়ে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন—তাঁদের জীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তো স্পষ্টই বলেছেন যে সুমিত্রার মৃত্যুতে বিক্রম সুমিত্রার প্রেমের সত্য উপলব্ধি করতে পারলেন আর অপর্ণা সুধামাখা কণ্ঠে 'পিতা' বলে আহ্বান করে রঘুপতিকে শান্তির পথেই নিয়ে গেলেন।

এইসূত্রে ট্র্যাজেডির মূল কারণটি অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে আমরা ট্র্যাজেডির আদর্শটি গ্রহণ করেছি। সেখানে এসম্বন্ধে কি বলা হয়েছে দেখা যাক্। সমস্ত ট্র্যাজিক ঘটনার মূলে এক ধরনের আত্যন্তিকতা থাকে। সর্বমত্যন্তং গর্হিতম বা chastisement of the Hubris এই সব উক্তির মূলে যে সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। তবে এখানে আত্যন্তিকতা বলতে কোন প্রবৃত্তির একরোখা ভয়ংকর ঝোঁক বা প্রবণতার কথাই বলা হচ্ছে। অসাধারণ শক্তিমান মানুষের মধ্যে যেখানেই এই ঝোঁক বা

প্রবণতা অথবা কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি বা মোহ দেখা যায় সেইখানেই পরিণামে ট্র্যাজেডি না ঘটে পারে না। এই প্রবণতা বা আসক্তি এমনই ভয়ংকর যে তা নায়ককে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে—তাঁর হিতাহিতজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তাঁর ভালোমন্দ সমস্ত প্রচেষ্টাই এই আসক্তির বা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পথে নিয়োজিত হতে থাকে। তাঁর সমগ্রসত্তা প্রবৃত্তির একান্ত বশীভূত হয়ে পড়ে—এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে ও অভিন্নভাবে জড়িয়ে যায় এবং এর মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এ ছাড়া তাঁর সত্তা যেন নিরস্তিত্ব বা অর্থহীন হয়ে যায়। তারপরে তিনি প্রচণ্ডবেগে চরম বিপৎপাতের দিকে, অনিবার্য ধ্বংসের দিকে—মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেন। ভয়ংঙ্কর বিপৎপাত, ক্ষয়, ক্ষতি, বিপ্লব, ধ্বংস, মৃত্যু কোন কিছুকেই তিনি গ্রাহ্য করেন না—চরিতার্থতা তাঁর চাই-ই। সব জেনেও যেন উপায়ান্তর থাকে না। এই প্রবৃত্তির মধ্যে এক ধরণের প্রচণ্ড শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশ থাকে। তাই Bradley বলেছেন, "It is a fatal gift but it carries with it a touch of greatness."

সত্যই এই প্রবৃত্তির অধিকারী চরিত্র মহৎ হতে না পারেন কিন্তু তিনি বৃহৎ। নৈতিকগুণসম্পন্ন মহাপুরুষ না হলেও যে তিনি অসামান্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর যে মহিমা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বংকিমচন্দ্রের সীতারাম, পশুপতি, শৈবলিনী, রবীন্দ্রনাথের বিক্রম, রঘুপতি, রক্তকরবীর রাজা, শ্যামা, শরৎচন্দ্রের সুরেশ, কিরণময়ী, সেকস্‌পীয়রের লীয়র, ম্যাকবেথ, ওথেলো এবং গ্রীক ট্র্যাজেডির চরিত্রসমূহ যে শৈল্পিক মহিমা অর্জন করেছেন সে কথা নিঃসংশয়িত ভাবে সত্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রচণ্ড জীবনীশক্তি, প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক একরোখা ঝোঁক এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বা মহিমা একযোগে ট্র্যাজিক চরিত্র সৃষ্টি করে থাকে। আর একটা বড় কথা এই যে এই প্রবৃত্তি জীবনের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে

যে—এর মূলোচ্ছেদ করতে হলে বুঝি জীবনেরই মূলোচ্ছেদ করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'পতঙ্গ' প্রবন্ধে এই প্রবৃত্তিকেই বহ্নি বলেছেন, রূপবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নি। তিনি বলেছেন, "এ বহ্নি কি আমরা জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?" তবু বলতে হয় বিশ্বধ্বংসক্ষম এই বহ্নিতে সর্বস্ব নিবেদন করে নিঃশেষে আপনাকে দান করে মানুষ জীবনের এক পরমবিকাশ সম্ভব করে তুলতে পারে এবং শিল্পজগতে তা পরমসম্পদ বলেই গৃহীত হয়। অতএব বলা যায় যে প্রবৃত্তির আত্যন্তিকতারূপ এই যে বহ্নি, সমস্ত ট্রাজেডির মূলে তাই রয়েছে ক্রিয়াশীল। শুধু সেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি সম্পর্কেই একথা সত্য নয়—সর্বত্রই এর সত্যতা স্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথও এই আত্যন্তিকতাকেই ট্র্যাজেডির মূল কারণ বলে নির্দেশ করেছেন কিন্তু নায়কের মৃত্যু পরিণামকে স্বীকার করেন নি। তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে মহদ্দুঃখের মধ্যে দিয়ে মানুষ এই আত্যন্তিকতার পাপ থেকে মুক্ত হ'তে পারে—পাপেরই মহতী বিনষ্টি ঘটে, পাপীর নয়। আর পাপীকে এই পাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, সত্যান্বেষী ও মহৎ চরিত্রের আত্মোৎসর্জন। জয়সিংহ, কুমার সেন, সুমিত্রা, শ্রীমতী, রঞ্জন, অভিজিৎ, চন্দ্রমাণিক্য এবং উত্তীয়ের আত্মদানের মধ্যে দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মালিনী

মালিনী ও ট্র্যাজেডি কিন্তু এর নাট্যগুণ একটু স্বতন্ত্র ধরণের। সেইজন্য নাটকটিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হ'ল।

নাটকের কাহিনীটি স্বপ্ন-লব্ধ। রাজা ও রানী বা বিসর্জন-এর মত এর বিস্তার বহুশাখায়িত নয়। মাত্র চারিটি দৃশ্যে সমাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় বলেছেন যে "মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন"। উক্তিটি প্রণিধান-যোগ্য। কবি ও গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ ট্রেভেলিয়ান এই নাটকের মধ্যে গ্রীকনাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছিলেন। এই দেখার মধ্যে সতর্ক এবং সত্য দৃষ্টির পরিচয় আছে। গ্রীক নাটকে চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা কাহিনীর (প্লটের) গুরুত্ব সমধিক। এখানেও তাই দেখা যায়। তা ছাড়া গ্রীক ট্র্যাজেডি সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেশকালের অবিচ্ছিন্ন ধারায় অবিসর্পিল ও অনিবার্য গতিতে অতি দ্রুত পরিণাম-দারুণ মুহূর্তের দিকে এগিয়ে চলে। নিরুপায় নায়ক একান্ত অসহায় যূপবদ্ধ বলির মত নিয়তিনির্ধারিত পরিণাম বরণ করতে বাধ্য হয়। ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়ের মর্মান্তিক পরিণামের মধ্যে এই অনিবার্যতা আছে।

এইবার নাট্যোল্লিখিত কাহিনীর কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করা যাক্। এর ভাবগত সত্য হচ্ছে, শাস্ত্রবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ধর্ম-বোধের সঙ্গে যে ধর্মের প্রেরণা গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ না থেকে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে, মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ ক'রে—সেই সহজ মানব ধর্মের বিরোধ। এই ভাবটি

রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয়। তাঁর ভাষায় সে ধর্মের স্বরূপ এই ভাবে প্রকাশিত :—

"যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেম স্নেহ,
যেথায় মানব, যেথায় মানবের গেহ।
বুঝিলাম, ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুনঃ দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ,
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে,
করে সর্বত্যাগ।"

একাধিক নাটকে এ-সত্যের রূপায়ণও আছে। এ নাটকের নায়িকা কাশীরাজদুহিতা মালিনী। তিনি যৌবনে শাস্ত্রাচারবদ্ধ আর্য (ব্রাহ্মণ্য) ধর্ম বর্জন করে নবধর্মে-বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আর্য ধর্মের নেতা ক্ষেমংকর এই নবধর্মের প্রতিরোধার্থে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্রাহ্মণগণ সহ রাজকুমারীর নির্বাসন দাবী জানালেন। ক্ষেমংকরের একান্ত প্রাণ-প্রিয় বন্ধু *সুপ্রিয় কিন্তু তাদের কাজ সমর্থন করতে পারলেন না। মালিনীর কাছে বিপন্ন রাজার এই দুঃসংবাদের কাহিনী গিয়ে পৌঁছল। তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করে প্রাসাদ বাহিরে বিদ্রোহীদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর আকস্মিক অপরূপ আবির্ভাবে এবং তাঁর করুণা-মাখানো বচনে ব্রাহ্মণগণের সংকল্প শিথিলমূল হয়ে কোথায় ভেসে গেল। তাঁরা রাজকুমারীর জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে তাঁকে রাজপুরীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা করলেন।

ক্ষেমংকর অটল, সমস্ত মোহের ঊর্ধ্বে সংকল্প তাঁর সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ। কিন্তু রাজকুমারীর অপরূপ আবির্ভাব সুপ্রিয়কে বিচলিত করে

*সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকরের সম্বন্ধটি বিনয় ও গোরার সম্বন্ধের অনুরূপ।

ভুলল। শাস্ত্রের দেবতা আর তাঁর দেবতা নয়। এতদিন পরে এ-মর্ত্যধরণী মাঝে মানবের ঘরে তিনি দেবতাকে খুঁজে পেলেন। ক্ষেমংকর বন্ধুর এই মোহস্বপ্ন রূঢ় আঘাতে ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর পরে দুরূহ কর্তব্যভার অর্পন করে প্রবাস যাত্রা করলেন—নব সমিধ সংগ্রহ করে বিদ্রোহানল পুনঃপ্রজ্বলিত করতে হবে, আর্য-ধর্মকে রক্ষা করতে হবে।

সুপ্রিয়ের এই মোহস্বপ্ন কিন্তু সত্যই মোহ নয়, এ তাঁর সত্য দৃষ্টি, নব জাগ্রত ধর্ম বোধ যা প্রেমের মহিমায় তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। ক্ষেমংকরের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের আবরণে আচ্ছন্ন ছিল তাঁর দৃষ্টি। তাঁর অনুপস্থিতিতে ধীরে ধীরে তা স্বচ্ছ হয়ে উঠল। তিনি বালকের মতো মালিনীর চরণতলে এসে বসলেন।

সভায় পণ্ডিত আমি তোমার চরণে
বালকের মতো। দেবী, লহ মোর ভার।
যে পথে লইয়া যাবে, জীবন আমার
সাথে যাবে, সব তর্ক করি পরিহার
নীরব ছায়ার মতো দীপ বর্তিকার।

মালিনীর মুখে যে-ধর্মের জ্যোতিঃরূপ ফুটে উঠল তাতে সুপ্রিয়ের সমস্ত সংশয়ের হল নিরসন। তিনি বললেন, "লভিলাম যেন আমি নব জন্মভূমি।"

রাজকুমারীর মধ্যে কি কোন পরিবর্তন ঘটেনি? তাঁর মধ্যেও জেগে উঠল চিরন্তনী নারী। সুপ্রিয়ের সাহচর্য তাঁকেও সেই ধর্মের সন্ধান দিল প্রেমের মহিমায় যার সুচির প্রতিষ্ঠা। বিমূঢ় সুপ্রিয় ক্ষেমংকরের সংবাদের জন্য সভয়ে অপেক্ষা করেন—বন্ধুদত্ত কর্তব্যভার তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে। এমন সময় বিদ্রোহের আসন্ন আভাস দেখা দিল। তিনি ক্ষেমংকরের দারুণ লিপি পেলেন। "লিখেছে সে—

রত্নাবতী নগরীর রাজগৃহ হতে
সৈন্য লয়ে আসিছে সে শোনিতের স্রোতে
ভাসাইতে নবধর্ম—ভিড়াইতে তীরে
পিতৃধর্ম মগ্নপ্রায়, রাজকুমারীরে
প্রাণদণ্ড দিতে।"

সুপ্রিয়ের মনে এল দ্বন্দ্ব। একদিকে প্রেম যা তাঁর কাছে অত্যাজ্য ধর্ম আর অন্যদিকে বন্ধুকৃত্য যার পালনে মহাবিপ্লবের সূচনা। শেষ পর্যন্ত জয়ী হল প্রেম। তিনি রাজাকে সে পত্র দেখালেন। ক্ষেমংকর হলেন বন্দী—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। কিন্তু বন্ধুর প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে মর্মে মর্মে দংশন করতে লাগল। তিনি মালিনীকে সব কথা জানালেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে মালিনী যে-কথা বললেন তাতে মালিনী চরিত্রের অপূর্ব নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমের মহিমায় মহিমান্বিতা শক্তিময়ী নারীর মতই তাঁর উক্তি :—

হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলে না হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্যসাথে? এ-ঘরে সে প্রবেশিত আসি
পূজ্য অতিথির মতো—সুচির প্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার।

ধ্রুবতীর্থে দেবী তপতী বিক্রমের আগমন-বার্তা শুনে এমন কথাই বলেছিলেন। সত্যধর্মীর দৃষ্টিতে বোধকরি সর্বভয় এমনি করেই তুচ্ছ হয়ে যায়।

সুপ্রিয়ের ঋণ-শোধ মানসে রাজা কন্যাকে তাঁর হস্তে অর্পণ করবার ইচ্ছা জানালেন। কিন্তু সুপ্রিয়ের পক্ষে এই দান গ্রহণ করা কি সম্ভব! এ যে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার। সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে তিনি মালিনীকে বললেন :—

আর কিছু চাহিব না—
দিতেছ নিখিলময় যে শুভ কামনা
মনে করে অভাগারে তারি এক কণা
দিয়ো মনে মনে"।

তখন মালিনীর বক্ষোমাঝে তাঁর চিরন্তন নারীমন প্রিয় বিরহিতা কপোতীর মত কেঁদে উঠেছে। তিনি ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করবার জন্য পিতাকে অনুরোধ জানালেন। এমন অবস্থায় তিনি ক্ষমা না করে পারেন না। তবু একবার ক্ষেমংকরের প্রচণ্ড শৌর্যের পরীক্ষা করতে উদ্যত হলেন।

দেখিব মরণ ভয়ে টলে কিনা টলে
কর্তব্যের বল। মহত্ত্বের শিখা জ্বলে
নক্ষত্রের মত—দীপ নিভে যায় ঝড়ে,
তারা নাহি নিবে।

সুপ্রিয় রাজার পদতলে লুটিয়ে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলেন। লজ্জার আভা রাঙা কন্যার মুখের দিকে চেয়ে রাজা পরম নিশ্চিন্ত হলেন।

কাহিনী এখানে একটি পরিণামে এসে পৌঁছেছে—পরিণামটি সুখান্ত—শান্তিময়—সৌভাগ্যসূচক। কিন্তু অকস্মাৎ কাহিনীর গতি পরিবর্তিত হয়েছে—বিপরীতমুখী ঘটনাবর্তে তীব্র পাক খেয়ে ছুটে চলেছে—দূরে ঘনায়িত প্রচণ্ড ঝড়ের আসন্ন আভাস। উপনীত হলেন বন্দীকৃত ক্ষেমংকর—অপূর্ব সে মূর্তি আপনাতে আপনি অটল।

'নেত্র স্থির উর্ধ্বশির ভ্রূকুটির প'রে
ঘনায়ে রয়েছে ঝড়; হিমাদ্রি শিখরে
স্তম্ভিত শ্রাবণ সম।

উপমার সার্থক প্রয়োগে চিত্রটির অপূর্বতা লক্ষ্য না করে পারা যায় না

রাজা তাঁকে বললেন—যদি প্রাণ
ফিরে দিই, যদি ক্ষমা করি।
উত্তর এল—ভীষণ উত্তর—

পুনর্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে।

মৃত্যুর সম্মুখেও তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন—কর্তব্যের পথে মৃত্যু তাঁর কারে তুচ্ছ, হীনদর্প অবনম্রফণা। এইখানে রঘুপতির সঙ্গে তার চরিত্রগত পার্থক্য। হীন স্বার্থসিদ্ধির আশায় তিনি মাথা নত করে প্রাণদান গ্রহণ করেন নি। তাঁর মধ্যে ট্র্যাজেডির নায়কের সেই fatal gift, প্রচণ্ড মহিমা ফুটে উঠেছে যা বলতে পারে—

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।'

মৃত্যুর উর্দ্ধে যে মহাশক্তির প্রতিষ্ঠা এ সেই অপরাজেয় পৌরুষ। ট্র্যাজিক চরিত্রের সর্বনাশা মহাসম্পদ।

রাজপদে তাঁর একমাত্র প্রার্থনা :—

'বন্ধু সুপ্রিয়েরে দেখিবারে চাহি।', রাজা তাঁকে আনতে আদেশ করলেন। অজানা আশংকায় মালিনীর বুক কেঁপে উঠেছে। 'বজ্রসম ভয়ংকর' সে মুখের দিকে চেয়ে তিনি পিতাকে নিষেধ করেছেন। রাজা তাঁকে আশ্বাস দিলেন। এখানে বিরোধী ঘটনাবর্তে নাটকীয়তার চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

সুপ্রিয় ক্ষেমংকরের প্রশ্নের উত্তরে অকপটে সমস্ত কথা স্বীকার করে মালিনীর জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন

ক্ষেমংকর তুমি দিবে প্রাণ —
আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান

প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়
তোমার বিশ্বাস।

তারপরে একটি মুহূর্ত। সমস্ত সংশয় দূরে সরিয়ে সুপ্রিয় ক্ষেমংকরের ব্যগ্র আলিঙ্গনে ধরা দিলেন। আনন্দে আশংকায় বেদনার আবেগে নিষ্ঠুরতায় মুহূর্তটি টলমল করে উঠল—তারপর মৃত্যুর মহাতরঙ্গে পড়ল ভেঙে। ক্ষেমংকর শৃংখলের প্রচণ্ড আঘাতে সুপ্রিয়কে হত্যা করে শেষ বন্ধুকৃত্য সমাপন করলেন। তাঁর মৃত দেহের উপর পড়ে ঘাতককে আহ্বান জানালেন; এ ঘটনা যেমন আকস্মিক, তেমনই স্বাভাবিক আবার যেমন অপূর্ব তেমনই ভয়ংকর। এই অংশের নাটকীয়গুণ সত্যই অসাধারণ। কিন্তু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয় যখন রাজার ক্রোধোদ্দীপ্ত রাজাদেশ—

কে আছিল ওরে

আন খড়্গ'—এর উপর মালিনীর শান্ত অবিচলিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়—

"মহারাজ ক্ষম ক্ষেমংকরে।" তার সত্তার গহন উৎস থেকে উত্থিত এই বাণী উচ্চারণ করে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এই অংশের নাটকীয় উৎকর্ষ তুলনা-বিহীন। বিদ্যুচ্চমকের মত মুহূর্তের চকিত দীপ্ত আলোকে মালিনীর অন্তরের যে রূপটি চোখে পড়ে তা সত্যই কল্পনাতীত অথচ একান্ত বাস্তব সত্য। মৈত্রী ও করুণার অপূর্ব মূর্তি দর্শকচিত্তকে ভয়াবহতার উর্দ্ধে করুণার কান্তলোকে উন্নীত করে। (যেখানে পূতপ্রদীপালোকে বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি সন্ধ্যাতার সম রহে ফুটি।)

এই উক্তির মধ্যে নারীহৃদয়ের যে গভীর রহস্য প্রকাশিত হয়েছে তা বিশ্লেষণের অতীত। শেষতম বিশ্লেষণে করুণাই যদি নারীর পরম সত্তা বলে স্বীকৃত হয় তাহলে এখানে কবি তাঁর অপূর্ব বস্তু-নির্মাণক্ষম-প্রজ্ঞা বলে তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—এ সেই absolute

dramatic vision—আত্ম-নিরপেক্ষ স্বচ্ছদৃষ্টি যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকে সম্ভব করে তোলে।

নিঃসন্দেহে এ নাটক ট্র্যাজেডি। তবু বিষণ্ণ ভয়াবহতার উপর ক্ষমার যে স্নিগ্ধ বারি সিঞ্চিত হয় তা মনকে অমৃতে অভিষিক্ত করে।

তপতীর ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে দুই মহাকবির কবি-কীর্তির সম্পর্কে এসেছিলেন, একজন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস আর দ্বিতীয়জন ইংলণ্ডের, মহাকবি সেক্সপীয়র। এই মহাকবিদ্বয়ের কাব্যাদর্শ নাটক রচনায় তাঁকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে যে-নাটকসমূহ (রাজা ও রানী বিসর্জন, মালিনী) রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে সেক্সপীয়রের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'রাজা ও রানী' নাটকের রেবতী চরিত্রে লেডি ম্যাকবেথের ছায়া আছে, অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার মূলগত বৈশিষ্ট্য নাটকীয়তা নয় গীতিধর্মিতা, তাই নাটক রচনায় সেক্সপীয়রের নাট্যরীতি তিনি বাংলা ভাষায় সার্থক করে তুলতে পারেন নি। তাঁর রচিত ট্র্যাজেডিসমূহে তিনি ট্র্যাজিক রস সৃষ্টির পরিবর্তে তাঁর প্রতিভানুযায়ী এক স্বতন্ত্র ধরনের রসসৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু মহাকবি কালিদাসের কাব্যাদর্শ, কাব্যরীতি যেন রবীন্দ্র-প্রতিভার সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' পড়বার পরে এ-বিষয়ে বোধকরি সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শুধু 'প্রাচীন সাহিত্য' বলি কেন, তাঁর কবিতা, প্রবন্ধও নাটকের বহুস্থলে কালিদাসের ভাবাদর্শ নবতর রূপে সৌন্দর্য্যে ও মহিমায় অপূর্ব ভাবে প্রক্তাশি হতে দেখ যায়। উপমা, ঘটনা, কাহিনী, নানা ছোটবড় ভাব ও ভাবনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে এখানে শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই—বিষয়টি যেমন গুরুতর তেমনই কবিদ্বয়কে বোঝবার ও বোঝাবার পক্ষে সহায়ক। কালিদাস মুখ্যতঃ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁর নাটকে ও কাব্যে প্রেমের একটি বিশেষ সত্যোপলব্ধির পরিচয় আছে।

সমস্ত প্রেমের মূলে আছে রূপমোহ ও ভোগবাসনা। কিন্তু কালিদাস এই মোহ ও বাসনাকেই প্রেমের পরম রূপ বলে স্বীকার করেন নি। বেদনার অশ্রুজলে ধৌত করে তপস্যার হোমানলে পরিশুদ্ধ করে সর্বমালিন্যবর্জিত স্বর্ণের মত তাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। দেহাশ্রয়ী প্রেম—কাম সুকঠিন তপশ্চর্যায় প্রেমে, অমৃতে রূপান্তরিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে কাব্যে এই প্রেমতত্ত্ব নানাভাবে প্রকাশিত। এমন কথা বলছি না যে, রবীন্দ্রনাথ এই জীবনসত্য কালিদাস থেকে গ্রহণ করেছেন, আমরা শুধু বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের এই সত্যোপলব্ধি কালিদাসের সমপর্যায়ের এবং এই উপলব্ধির উন্মেষে ও বিকাশে কালিদাস তাঁর প্রধান সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের চিত্তের গহনে নিশ্চয়ই এই সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল কারণ একথা সত্য যে কোন কবিই পরস্বাপহরণ করে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে 'কুমার সম্ভবম্' কাব্যের পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের তপস্যা যে রবীন্দ্রকাব্যে নবনব মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 'কুমার সম্ভবম্'-এর মূল কথাটি এখানে সংক্ষেপে বলে নিতে চাই। কামনা সুকঠোর তপস্যার মাঝ দিয়ে সার্থক প্রেমে পরিণত হয়েছে। পার্বতী যৌবনকে নিগৃহীত করেছেন, রূপকে নিপীড়িত করেছেন, যা কামনার সীমায় বাঁধা ছিল তাকে কল্যাণে রূপান্তরিত করেছেন। যা বিশ্বদাহকারী অগ্নি তাই এখানে দাহহীন জ্যোতিঃসত্তায় পরিণত। কন্দর্প বিরূপাক্ষের কাছে পরাজিত এবং নব মহিমায় পুনর্জীবিত। কামনার পরাজয়ে মঙ্গলের উদ্ভব—কুমারের সম্ভাবনা—দানব নিপীড়িত স্বর্গের উদ্ধার।

রবীন্দ্রনাথের দুইটি নাটকে অথবা একই নাটকের দুইটি পৃথক রূপায়ণে কি এই সত্যের নবতর প্রকাশ ঘটে নি? 'তপতী'র ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে, সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য-উপলব্ধি

বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটাই 'রাজা ও রাণী'র মূল কথা।' অর্থাৎ প্রেমের সত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে আসক্তির অবসান ঘটাতে হবে আর এই সত্য-উপলব্ধির জন্য সুমিত্রার মৃত্যুর প্রয়োজন ঘটল। অবশ্য কালিদাসের কাব্যে বা নাটকে এই মৃত্যু ঘটেনি, সেখানে সুদুঃসহ কঠোর দুঃখভোগের পর মিলন আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের নাটকে কাহিনী ও দ্বন্দ্বের প্রকৃতি আরও জটিল—তাঁর সমস্যা আরও কঠিন ও দুর্বহ। কালিদাসের মত সহজ ও সরল নয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কন্দর্পের পরাজয় ঘটেছে ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে। জালন্ধরে যিনি রুদ্রভৈরব, কাশ্মীরে তিনিই মার্তণ্ডদেব। বিপাশা রাজভ্রাতা নরেশকে বলেছেন 'যাক মীনকেতুর বেদী ভেঙে, সেখানে তোমার আসন ধরবে না, রুদ্রভৈরবের নির্মাল্য আনব তোমার জন্যে। এখানে তিনি ভৈরব, কাশ্মীরে তিনিই মার্তণ্ড, সেই দেবতাকে প্রসন্ন করো বীর।"

নাটকের সূচনাতেই একটি সঙ্গীতের মাঝ দিয়ে কবি সমগ্র নাটকের বিষয়বস্তু সংকেতিত করেছেন :

'দূর ক'রো মহারুদ্র
যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র।'

অপূর্ব এই সঙ্গীতটির ব্যঞ্জনা। মীনকেতুর পূজা-আয়োজনের সূচনায় ভৈরবের আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠলো। ভৈরবের স্তব দিয়ে তার ভূমিকা। বিক্রমদেবকে বলতে শুনি, 'তোমাদের ভৈরবের স্তব সম্পূর্ণ হবে না, আমাদের মীনকেতুর স্তব যদি তার সঙ্গে না যোগ করি।' মীনকেতুকে আহ্বান করে তিনি বললেন :

ভস্ম অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু—
রুদ্র বহ্নি হ'তে লহ জ্বলদর্চি তনু।

নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে বিক্রমদেব তাঁর শেষ কথা উচ্চারণ করে চরম পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন : "তারপরে চলব তীর্থের

পথে। কন্দর্পদেবের পরিচয় পূর্বেই পেয়েছি, এবার নেব মার্তণ্ডদেবের পরিচয়। যে উৎসব জালন্ধরের দেবমন্দিরে আরম্ভ করেছিলুম, কাশ্মীরের দেবমন্দিরে সেই উৎসবের সমাপ্তি হবে।” সুমিত্রাও বলেছেন শেষে, ‘আসুন এইখানেই, নইলে তাঁর মুক্তি কিছুতেই হবে না। আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে—তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাব।’ দেবীর কথাগুলি লক্ষ্য করবার। মুক্তি বা বাঁচানোর অর্থই হচ্ছে মোহগ্রন্থি ছিন্ন করা। বিক্রমদেবকে আত্মবিস্মৃতি থেকে মুক্ত করে জীবনসত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আর তার জন্য চাই মার্তণ্ডদেবের অর্থাৎ রুদ্রভৈরবের চরণে আত্মনিবেদন। কন্দর্পের পূজায় যাঁর সূচনা, ভৈরবের চরণে আত্মনিবেদনে তাঁর পরিসমাপ্তি। চরম ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে পরম রিক্ততার মিলন—এইখানেই প্রেমের মহান সত্যোপলব্ধি—জীবনের সমগ্র পরিচয়। কন্দর্প ও ভৈরব যেন একই সত্যের সূচনা ও সমাপন। চরম প্রাপ্তি ও পরম দান। কালিদাসের কাব্যাদর্শ কি এই নাটকে ভিন্নতর ভাবে প্রকাশিত হয় নি ?

এই প্রসঙ্গে পাপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। শান্তিনিকেতনের ‘তপোবন’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ‘অংশের প্রতি আসক্তি বশতঃ সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ’ অথবা ‘কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ।’ ‘কুমার সম্ভবম্’-এর আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাগুলি তিনি বলেছেন কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যায় ‘মেঘদূতম্’ এবং ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ সম্বন্ধেও কথাগুলি সত্য। যক্ষ প্রেমে অন্ধ হয়ে—স্বাধিকার-প্রমত্ত হয়ে রাজকার্যে অবহেলা করেছিলেন। তাতেই তিনি পাপ করেন এবং তাঁর উপরে প্রভুর অভিশাপ বর্ষিত হয়—তিনি নির্বাসিত হন। শকুন্তলায় এ-সত্য আরো চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আশ্রমের অতিথি-সৎকারের ভার শকুন্তলার পরে ন্যস্ত ছিল। পতিধ্যাননিমগ্না শকুন্তলা

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অতিথিসৎকারে অবহেলা করেছিলেন। এবং তার জন্য সংসার তাকে ক্ষমা করে নি, দুর্বাসারূপে আবির্ভূত হয়ে তাকে অভিশাপ দিয়েছিল। প্রশ্ন জাগে: শকুন্তলার স্বামীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া কি পাপ? উত্তরে বলতে হয় যে, সংসারের সহিত যোগবিচ্ছিন্নতা, কর্তব্যে অবহেলা এবং কেবলমাত্র আত্মবদ্ধতা যদি পাপ হয় তাহলে পাপ বৈকি আর তার জন্য দণ্ডও ভোগ করতে হবে।

'রাজা ও রাণী' এবং 'তপতী' নাটকে অত্যধিক আত্মাদর, ঐকান্তিক বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক কর্তব্যে অবহেলা—যাকে রবীন্দ্রনাথ প্রচণ্ড আসক্তি বলেছেন—পাপ রূপেই জাগ্রত হয়ে নাটকদ্বয়ের করুণ পরিণাম আনয়ন করেছে। এখানে বিরোধের প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং জটিল বলে পরিণামের পার্থক্যেও অপূর্বতা। পাপের এই ধারণায় কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবোধ রয়েছে।

অতঃপর নাটকের কাহিনী যুগ্মধারায় কাশ্মীরের ধ্রুবতীর্থে এসে পৌঁছল। 'ধ্রুবতীর্থ' নামটি লক্ষণীয়। কবি কি এই কথার মাঝ দিয়ে চিরন্তন কোন সত্যতীর্থের ইঙ্গিত করেছেন যা ধ্রুব অর্থাৎ অটল ও চিরস্থির। একটি ধারা বিক্রমদেব ও সুমিত্রাকে কেন্দ্র করে আর অন্যটি নরেশ-বিপাশাকে আশ্রয় করে ধ্রুবতীর্থে মিলিত হল। নরেশ পরিপূর্ণ প্রেমে—যার অনুভূতিতে সকল ধ্বনি আলোক হয়ে ওঠে—প্রত্যক্ষভাবে অন্তরে প্রবেশ করে আলোয়-আলোকময় সেই নির্দ্বন্দ্ব মুক্তির সন্ধান পেলেন আর দেবী সুমিত্রা প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নিতে আত্মোৎসর্জনের মধ্যে মুক্তিলাভ করলেন ও বিক্রমদেবকে মুক্ত করলেন। এখানে প্রেম নয় মৃত্যু এল মুক্তিদাতা রূপে। মৃত্যু ও প্রেম সম্বন্ধে এই-ই বোধ করি কবির ধারণা।

শেষকথা, মহাভারতের আদি পর্বের অন্তর্গত 'তপতীও সংবরণের কাহিনী থেকে 'তপতী' নাটকের মূল সূত্রটি গৃহীত হয়েছে। ভোগ

ও ত্যাগের প্রশ্ন সেখানেও আছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ'-নাটিকায় 'তপতীর' প্রথম উল্লেখ পাই :

পত্নীবর মাগি
করেননি সংবরণ তপতীর আশে
প্রথম সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর তপস্যা কত ?

বলাবাহুল্য তপতী নাটক এই কাহিনীর নবায়ন।

সাংকেতিক নাটকের পরিবেশ

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের সাধারণ লক্ষণ, বিশেষ করে পরিবেশ রচনার বৈশিষ্ট্য সমূহ এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

ভূমিকায় একটি কথা স্মর্তব্য যে তাঁর নাটকের পরিণামে মহাক্ষয়ই একান্ত হয়ে ওঠেনি, সেখানে শান্তির বাণীই উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর জীবন দর্শনে অশান্তির সুর কেবল মাঝের কথা শেষের কথা নয়। "চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কখনও আশ্রয় পেতনা—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—রুদ্র তোমার যে প্রসন্নমুখ তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো।

চরম সত্য ও পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্নমুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু সেই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে।" (আত্মপরিচয়-৩) অশান্তির বিক্ষুব্ধ-তরংগ সমুদ্র শান্তির পথে—পূর্ণতার পথেই আমাদের নিয়ে যায়। তাই কবির দৃষ্টিতে প্রয়াস নয় প্রাপ্তি, বিরোধ নয় মিলন, মোহ নয় মুক্তি এবং মৃত্যু নয় অমৃতই জীবনের তথা সৃষ্টির পরম সত্য। অন্যান্য নাটকের মত সাংকেতিক নাটকেও এই সত্যদর্শনই সুস্পষ্ট।

((গুহাহিতকে রূপ দেওয়া, অনন্ত অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্যভরা সৌন্দর্যের রূপায়ণ এই ধরণের নাটকের অর্থাৎ সাংকেতিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান লক্ষ্য অরূপ ও অসীমের রহস্য সন্ধান। জীবনের দুই সীমান্তে অন্ধকার—অব্যক্ত রহস্যে ভরা; মধ্যে যতটুকু ব্যক্ত তাও সম্পূর্ণ জানিত নয়। এই অনালোকিত, অনাবিষ্কৃত

রহস্যময় জগৎকে (যা জীবনকে এবং জীবনোত্তরকে ঘিরে বিরাজিত রয়েছে) সংকেতিত করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য—এ এমন দেশ যে বাক্য এখান থেকে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে। একে আভাসে ইংগিতে—মনশ্চক্ষুর গোচরে আনতে হবে তাই এই নাটকের আংগিকের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এ নাটক যতখানি ভাবায় ততখানি মাতায় না—যতখানি মগ্ন করে ততখানি উত্তেজিত করে না। অবচেতন লোকের অনালোকিত অন্ধকারে—আত্মার গহনে অথবা মৃত্যুর মধ্যে যে রহস্য অনুভূত হয়, অভাবিত না হলেও যা একান্তভাবে অনির্বচনীয় তাকে বচনীয়তার সীমায় ধ'রে দিতে হ'বে। আধখোলা দ্বারের স্বল্পালোকিত পথে রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়, —তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় অথচ তাকে প্রকাশ করার ভাষা নেই। সাংকেতিক নাটকের রচয়িতাকে এমনই এক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। দ্বন্দ্বসংঘাতময় বহির্ঘটনার প্রাধান্য; আবেগ-উত্তেজনাপূর্ণ উচ্ছ্বসিত জীবনের বর্ণনা এবং প্রবৃত্তির ঘনঘটা-বিচ্ছুরিত বর্ণালিম্পের স্থান এখানে নেই। এখানে রচয়িতা তলিয়ে যান অন্তরের অতল গভীরে, আত্মার গহনে যেমন ডুবুরি তলিয়ে যায় নিরন্ধ্র-অন্ধকার গভীর সিন্ধুতলদেশে আর তারই মত রতন কণিকা কুড়িয়ে আনেন যা তলদেশের অজানিত কিন্তু নিঃসংশয়িত অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়—তার রহস্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে অথচ যার কূলকিনারা করা যায় না। শুধু নিশ্চিত ধরার মাঝে অধরার আভাসটুকু ছুঁইয়ে দিয়ে জীবনের সীমাকে বর্দ্ধিত করা যায়, জীবনকে মহত্তর সম্পদে বিভূষিত করা যায়। তাই দেখা যায়, একজন বৃদ্ধ আমার কেদারায় বসে জীবনের যে রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে—প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘাতময় জীবনসমুদ্রের মহাকল্লোলেও তার কিছু শোনা যায় না।

এ নাটক জীবনোত্তরের কাহিনী। সাংকেতিক নাট্যকার এখানে প্রাক্তন সংস্কার বা সাধনার বলে জন্ম-পূর্বলোকে ও মৃত্যুর

মহালোকেও হানা দিয়েছেন—সত্য আহরণ ক'রেছেন। তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা মৃত্যু-রহস্যের সমাধান করতে উদ্যত এবং পরমাত্মার ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। রচয়িতা শুধু জীবনরসের রসিকই নন, জীবনোত্তরও তাঁর সাধনায় প্রকাশিত। তাই তিনি মরমী কবি mystic আখ্যা পেয়ে থাকেন। এছাড়া সাংকেতিক নাটকের অন্য একটি ধারা আছে। প্রথমেই বলা হ'য়েছে, জীবনের অব্যক্ত রহস্য (জীবনোত্তরকে ঘিরে যার প্রকাশ) অথবা মনের অচেতন লোকে যে-সব অপরিচিত বা অর্ধপরিচিত প্রাণীর আনাগোনা সাংকেতিক নাটকে তাদের রূপায়িত করা হয়। এখানে কিন্তু নাট্যকার জীবনের ক্ষেত্রে নিতক্রিয়াশীল কোন সামাজিক, রাষ্টীয় বা ধর্মীয় নীতি, অন্ধশক্তি বা আদর্শবাদকে অবলম্বন ক'রে নাটক রচনা করেন—যেমন জড়বাদ, সাম্রাজ্যবাদ বা অন্ধসংস্কার, যারা একদিন স্বাভাবিকভাবেই জীবনে উদ্ভূত হয়ে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথেই সহায়তা ক'রেছিল আর পরবর্তীকালে যারা নানা কারণে নানাবিধ স্বার্থের সংগে জড়িত হ'য়ে অস্বাভাবিক রূপান্তর গ্রহণ ক'রেছে এবং জীবনের স্রোতে জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে শাশ্বত কল্যাণের পথ রুদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" "রক্তকরবী" "অচলায়তন" এই ধরনের নাটক। এরূপ নাটকে সভ্যতার বিশেষ স্তরের কোন বিষয়ে সমস্যা বা ব্যাধির কথাই বড় হ'য়ে দেখা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সাময়িক সমস্যাকে অতিক্রম ক'রে এরা চিরন্তন সমস্যার দিকে আমাদের জাগ্রত ক'রে তোলে। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের নাটকে চিরন্তন সমস্যায় দিকটি অপ্রকাশিত নেই। যন্ত্রদানবের অনাসৃষ্টিকে বৃহত্তর যন্ত্রসৃষ্টি ক'রে অপসারিত করা যাবে না, প্রাণ দিয়ে তাকে ঠেকাতে হবে অর্থাৎ অন্যায়কে বৃহত্তর অন্যায়ের দ্বারা ঠেকানো যায় না অথবা সভ্যতা এবং শাস্ত্রাচারবদ্ধ সংস্কার যেখানে জটিলতার সৃষ্টি ক'রে স্পর্ধিত বাধার জগদ্দল পাথরের মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তাকে বিনষ্ট করতে বিদ্রোহ অথবা

যৌবনশক্তির মহামৃত্যু-বরণের প্রয়োজন আছে—এই কথাগুলি সাময়িক নয়, চিরন্তন সত্যের আভাস।

এমন ব্যাপারে আংগিকের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং নিম্নলিখিত ভাবে সে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে :—

(১) বহির্ঘটনার অপেক্ষাকৃত বিরলতা

(২) গতিশীল ঘটনা অপেক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির উপর অধিক জোর দেওয়া।

(৩) সরবতা অপেক্ষা সংকেতের প্রাধান্য।

(৪) আলো-আঁধারি দৃশ্যাবলি—অন্ধকারাচ্ছন্ন আধখোলা দরজা ও আপাত দৃষ্টিতে অর্থহীন অদ্ভুতদৃশ্য (রক্তকরবীর জালাবরণ) প্রভৃতি সাহায্যে কবি নিগূঢ়, অব্যক্ত, ভাষায় অপ্রকাশিত রহস্যের সন্ধান দেন।

(৫) চরিত্রসৃষ্টিতে আবেগ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য; ফলে মানব-রসের অপেক্ষাকৃত হানি!

(৬) সজ্ঞানে কোন একটি তত্ত্বের রূপায়ণ।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকে আংগিকের এই সকল পরিবর্তন সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশ রচনা, চরিত্রসৃষ্টি, তত্ত্বপ্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপারে এগুলি ব্যাখ্যাত হবে। তবে তাঁর নাটকে কিন্তু বহির্ঘটনার বিরলতা থাকলেও সরব বাক্যের বিরলতা নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সাংকেতিক নাটকে ঘটনার একটানা প্রবাহ অপেক্ষা পরিস্থিতি বা ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। অন্যান্য নাটকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও প্রাণবান নরনারীকে আশ্রয় ক'রে কাহিনীর সচল প্রবাহ তীব্রভাবে সংঘর্ষের মাঝ দিয়ে ছুটে চলে। কিন্তু এখানে ঘটনার বিরলতা হেতু একটি ভাবের পরিমণ্ডল রচনা করতে হয়, মন তাকে আশ্রয় করে হয় গভীরতায় ডুবতে থাকে নয় দৃশ্যমান বস্তুর ঊর্দ্ধে উঠতে চেষ্টা করে।

সাংকেতিক নাটকের 'পথের' দৃশ্য শুধু বাস্তব পথেরই সন্ধান দেয় না সুদূরের রহস্যের সংকেতাভাসও করে। দৃশ্যাবলি বা মঞ্চসজ্জা লক্ষ্য করলে এ-কথার তাৎপর্য বোঝা যায়। এই সকল শুধু স্থানকে জুড়ে বসে না, মনকেও অধিকার করে। এরা নাটকের অপরিহার্য অংগ এবং চরিত্রগুলির মতই প্রয়োজনীয়। অনেকস্থলে এরা বর্ণিতব্য বিষয়ের সংকেতাভাস, যেন নাটকের প্রবেশ-দ্বার। নাটকের ভাবলোকে উত্তীর্ণ হ'তে গেলে এদের সহায়তা না পেলে চলে না। তাই এরা সাধারণ দৃশ্যসজ্জার অনুরূপ নয়। অভিনয়কালে এগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। 'ডাকঘর' নাটকের শেষদৃশ্য এবং অপর কয়েকটি নাটকের পটভূমিকা আলোচনা করলে এ-কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

'ডাকঘর' নাটকের দৃশ্যযোজনা সুচিন্তিত বা সুপরিকল্পিত, বিশেষ করে শেষ দৃশ্যটি। এই নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। দৃশ্যসজ্জা কিছুতেই মনঃপূত হয়না এমন সময় অবনীন্দ্রনাথ একটি শূন্য দাঁড় এনে মঞ্চের একান্তে ঝুলিয়ে দিলেন। শূন্য দাঁড়, শিকলটি নীচে ঝুলে পড়েছে। দৃশ্যের অপরূপ রূপান্তর ঘটলো। সত্যই দৃশ্যটি যেন এতক্ষণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'ল। শূন্য দাঁড়ের সংকেতটি অর্থহীন নয় (অবশ্য সাধারণ নাটকে এর কোন বিশেষ অর্থ নেই)। আপাত-দৃষ্টিতে বস্তুটি একান্ত তুচ্ছ হ'লেও মুহূর্তে নাটকের মর্মকথাটি প্রকাশ ক'রে দিলে। সমস্ত বাঁধন কেটে বিহংগ উড়ে গিয়েছে। নীল আকাশের স্বপ্ন, সবুজবনের শ্যামল মায়া, দিশাহীন সুদূরপথের অন্তহীন রহস্য তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তার বাঁধন, সুখের বাঁধন কিছুতেই তাকে ধরে রাখতে পারেনি। (এই সূত্রে বলে রাখা ভালো যে বিহংগ রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত একটি প্রিয় প্রতীক।) সুদূরের পিয়াসী অমলের কথাটিও কি তাই নয়? পৃথিবীর সহস্র মায়াবন্ধন আকুল আগ্রহে বাহুবিস্তার ক'রে তাকে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু ডাক আসে

সুদূরের, বন্ধন হয় শিথিল, হয় ছিন্ন, অমল চলে যায় মুক্তপক্ষ সিন্ধু-বিহংগমের মত সুদূরের স্বপ্নে মগ্ন হয়ে। শূন্য দাঁড় দর্শকের মনে এইসব কথাই উচ্চকিত ক'রে তোলে। এটি দেওয়ার পরে বুঝতে পারা যায়, না দিলে নাটকের কতখানি অংগহানি ঘটতো। এর থেকে বলা যায় না কি যে এটি যোজনা করার একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং এর দ্বারা নাটকের রহস্যটি আরও ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে।

'ফাল্গুনী'-নাটকের শেষ দৃশ্য গুহাদ্বার। দ্বারপথে চন্দ্রহাস বুড়োর সন্ধানে গুহামধ্যে প্রবেশ করলে। যখন ফিরে এলো তখন দেখা গেল বুড়োর জীর্ণ আবরণ গিয়েছে খসে। যাকে দূর থেকে বুড়ো ব'লে মনে হ'য়েছিল সে বালক-বেশে ফিরে এসেছে। ছদ্মবেশ পরিত্যাগ ক'রে বসন্তের রূপরসে সঞ্জীবিত হ'য়ে ফিরে এলো সেই বুড়ো। দেখা গেল যিনি জীর্ণ, যিনি শীত তিনিই বসন্ত, প্রাণরসে-ভরা ধরণীর ধ্যানভরা ধন। পিছনদিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হ'য়েছিল, সামনের দিক থেকে দেখা গেল, সেইটাই যৌবন। নাটকের পরিণামে এই সত্যটিই রসোজ্জ্বল অক্ষরে দর্শকের চিত্তে মুদ্রিত হ'ল। এই গুহামুখ একেবারে অর্থহীন নয় আবার খুব স্বাভাবিকও নয়, কেমন একটা রহস্যকে সংকেতিত করে। 'ধর্মস্যতত্ত্বং নিহিতংগুহায়াম্' —এই গুহাহিত তত্ত্বকে রূপ দেওয়ার জন্যই কি গুহামুখের অবতারণা নয়? এই গুহামুখের দৃশ্যটি নাটকের ভাবের সম্পূর্ণ উপযোগী পরিস্থিতি-সৃষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য "ফাল্গুনী" নাটকের অনবদ্য সংলাপ ভাবের পরিমণ্ডল রচনায় অদ্ভুত সহায়তা করেছে। প্রতীক্ষারত যুবকদলের সংলাপ অতর্কিতে মনের মধ্যে প্রবেশ করে ভয়ে বিস্ময়ে সন্দেহে আশায় মনকে অভিভূত ক'রে ফেলে। অতি দীর্ঘ দুঃখ রজনীর অন্ধকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে বহু ঈপ্সিত প্রভাতের অপেক্ষায় মন যখন পীড়িত হ'তে থাকে, মনে হয় দুঃ-দুঃ-রজনীর বুঝি শেষ নেই—শেষ হবে না অথচ আশা না করেও পারা যায় না

তখনকার শংকা, সংশয়, বেদনা, আশা সবই অপূর্বভাবে এখানে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থে'র পরিস্থিতির সঙ্গে এই নাটকের পরিস্থিতির তুলনা করা যায়।

"মুক্ত-ধারার" প্রথম দৃশ্য এই ভাবে পরিকল্পিত "উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তর-ভৈরব মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরব মন্দির চূড়ার ত্রিশূল—ইত্যাদি।" সাম্রাজ্যবাদ এবং অত্যুগ্র জাতীয়তাবোধ এবং তাদের প্রধান অস্ত্র যন্ত্রদানব কেমন করে জীবনের সহজ বিকাশের পথ রুদ্ধ ক'রতে উদ্যত হয়েছে এইখানে তা প্রকাশিত। যন্ত্রদানবের গর্বোদ্ধত স্পর্ধিত মূর্তি শিবতরাই-বাসীদের তৃষ্ণার বারিই শুধু হরণ করেনি নীলাভ্রদ্যুতি আকাশের অন্তহীন স্বচ্ছতাকেও আবিল ক'রে তুলেছে। আকাশ মানুষের পরম আশ্রয়, প্রভাতের রৌদ্র-ঝলমল আকাশ, নক্ষত্রদ্যুতি-রোমাঞ্চিত আকাশ—শারদচন্দ্রমাবিধৌত আকাশ, মানুষের মনকে, জীবনকে নানাভাবে ঘিরে রেখেছে। আজ বুঝতে পারিনে কিন্তু মাথার উপর থেকে কোনদিন যদি আকাশখানা যেত হারিয়ে তবে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারতাম। এই যন্ত্রদানব সেই চিরদিনকার আকাশকে আবিল ক'রে তুলতে চায়।—'যাকে দিনরাত্তির দেখতে দেখতে প্রাণ-পুরুষ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায়,' এমনই ভয়াবহ সেই যন্ত্রদানব। এই তো গেল একদিক। আর অন্যদিকে চেয়ে দেখি—'ভৈরব-মন্দির চূড়ার ত্রিশূল'-এ নটরাজের সংহারক মূর্তির প্রতীক, যা যন্ত্রের এবং যন্ত্ররাজের দম্ভমদোদ্ধত স্পর্ধাকে ধূলায় লুণ্ঠিত ক'রে দেবে, মানুষের কাছে বহন ক'রে আনবে আশা ও আশ্বাসের বাণী। ভৈরবের অমিত শক্তি অভিজিতের মাধ্যমে যন্ত্রদানবকে মরণ আঘাত হানলে—যন্ত্রদানব সে আঘাত দিলে ফিরিয়ে। অভিজিৎ গেল ভেসে কিন্তু মুক্তধারার বাঁধন পড়লো খসে, মানুষ রক্ষা পেল। মুক্তধারার দৃশ্য যোজনার মধ্যে যে ভাব-সংকেত

রয়েছে বা যে ভাব-পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে নাটকের পক্ষে তা কতখানি অপরিহার্য সে-কথা বোধ করি বলে দিতে হবে না।))

'রাজা'-নাটকের প্রথম দৃশ্য অন্ধকারগৃহ বিশেষ অর্থময়। সত্য-কথা বলতে কি এইটে না থাকলে নাটকটি অনেকখানি অর্থহীন হ'য়ে পড়তো। সব-ডুবানো এই নিরন্ধ্র অন্ধকার সাধনার প্রতীক। বহির্বিষয় থেকে বিবিক্ত হ'য়ে মানুষ অন্তরের গহনে ডুব দেয়, সেখানে তাকে পার হ'তে হয় সাধনার দুস্তরবারিধি যা দুঃখে শংকায় সমাচ্ছন্ন হ'লেও 'তমসঃপরস্তাৎ' আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষের (যাঁকে জানলে পরে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়) নিঃসংশয়িত সন্ধান দিতে পারে। সুদর্শনা রাজার রাণী শুনেছেন কিন্তু তাঁর রূপ সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধনার সিদ্ধি সম্পর্কে নিঃসংশয় হ'তে পারছেন না। সিদ্ধি তো সহজ নয়, তার জন্য যে দুশ্চর এবং দুঃসাধ্য সাধনার প্রয়োজন আছে। অন্ধকার ঘরটি এই দুঃখসাধ্য সাধনার প্রতীক আর অরূপের আবির্ভাবের অপরূপ পরিবেশ। নিরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় রাজার সুগভীর বাণী যার মধ্যে অন্তহীনের ব্যঞ্জনা অনুরণিত আর ভেসে আসে রাণী সুদর্শনার ব্যাকুল হৃদয়ের করুণ প্রার্থনা, রাজাকে স্পষ্ট দিবালোকে—ইন্দ্রিয়-পথে দেখবার আকুল আগ্রহ। দর্শকচিত্তও অন্তহীনের পায়ের ধ্বনি শুনতে পায়—তাঁর আবির্ভাব অনুভব করে। সমস্তটা মিলিয়ে কেমন যেন অতীন্দ্রিয় রহস্যে চিত্তলোক আচ্ছন্ন হয়।

'রক্তকরবী'র প্রচ্ছদপট, জালাবরণটি এই নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য। এর বাইরে নাটকের সমস্ত ব্যাপার ঘটছে। প্রথম দৃষ্টিতে জালাবরণটি ঊর্ণনাভের জালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঊর্ণনাভের মতোই মানুষ নিজের ভিতর থেকে যন্ত্রসভ্যতার এই জটিল জালাবরণ সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে বসে আছে। প্রাণবান সচলতার মাঝখানে এ এক অচল বিকার। সে অপরকে ধরবার চেষ্টায় আছে কিন্তু জানেনা যে সে নিজের রচা-জালে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছে। অবশ্য এ-জালে

একদিন অদ্ভুতজীব ধরা পড়ে একে ছিন্ন করে, কারণ বিশ্ববিধানের বিরোধী এই জাল। একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে জটিল এ-জাল উর্ণনাভের জালের চেয়েও ভয়ংকর। এ শুধু বিস্ময়েরই সৃষ্টি করে না, দর্শককে বিমূঢ়তায় স্তব্ধ করে, তার মনে এক ধরণের অস্বস্তি ও বিভ্রান্তিময় ভয়াবহতার সৃষ্টি করে। সৃষ্টি প্রবাহের পথে এ এক 'স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা'। অবশ্য অদ্ভুত জানালা একটা আছে, একটা বন্ধগুহার মতো তা যেন একে কিম্ভুত করে তুলেছে। তার মাঝখান দিয়ে একদিকে চোখে পড়ে যক্ষরাজের বজ্রদৃঢ় মুষ্টি, নিষ্পেষণের প্রতীক আর অন্যদিকে নন্দিনীর হাতের রক্তকরবীর গুচ্ছ। কোমলে কঠোরে এ এক ভয়ংকর ছবি। দেখতে দেখতে ভয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়, তবু এর আকর্ষণ কমে না। জালাবরণ যে আকর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতীক তার ধর্মই এই। যন্ত্রসভ্যতার বিরাট কারখানা ঘরে প্রবেশ করলে মনের মধ্যে এমনই ভয়াবহ বিমূঢ়তার ভাব আসে। প্রথমে মানবের দানবীয় শক্তি ও দম্ভের বিরাটোদ্ধত প্রকাশ মনকে অভিভূত করে তারপরে যখন তলিয়ে দেখা যায় যে কেমন করে এই যন্ত্রদানব শোষণের জন্য করাল দংষ্ট্রা বের করেছে এবং মানুষকে 'রুদ্ধগতি, কদাকার প্রাণ' ও 'আত্মায় বামন' ক'রে তুলছে তখন এই যন্ত্রসভ্যতার মধ্যে একটা কানা রাক্ষসের অভি-সম্পাতের কথা ভেবে বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন, এই সৃষ্টি-প্রবাহ চিরচঞ্চল। প্রলয়ে সৃজনে এই প্রবাহ। এ প্রবাহ থামতে জানেনা থামতে পারেনা এবং একে থামানো যায়না। থামলে কি হ'বে দেখা যাক: সঞ্চয়ের অচল বিকারে 'স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা সৃষ্টি ক'রে বেদনার শূলে আকাশের মর্মমূলকে বিদ্ধ করবে। সেদিন চিরদিনকার অবারিত, নীলাম্বুদলের মতো নীল, বন্ধুর মতো প্রসন্ন আকাশখানা জীবন থেকে যাবে হারিয়ে। থেমে-থাকা এমনই বিরোধী, এমনই অস্বাভাবিক। মানুষও এই সৃষ্টি প্রবাহের অঙ্গীভূত—সেও চিরযাত্রী।

সূর্যচন্দ্র-গ্রহতারা যে পথে ভীষণ নীরবে চলে মানুষও সেই চলার পথে তাদের সহযাত্রী। সে যদি থামে তবে অচল বিকারের সৃষ্টি করবে আর তা হ'বে স্বাভাবিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী। আকর্ষণজীবী, ধর্ষণজীবী এই যন্ত্র-সভ্যতার দানবীয় নিষ্ঠুরতা, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাকরাল ভয়ালরূপ সহজ প্রাণের যাত্রাপথে এমনই বিরোধের সৃষ্টি ক'রেছে। মানুষ এর চণ্ডশক্তিকে সত্য বলে ভাবছে; কিন্তু এটা সত্য নয়, যেমন যত প্রচণ্ডই হোক্ ঘূর্ণিটা সত্য নয়—সত্য চিরচঞ্চল শাশ্বত প্রবাহ। জালাবরণ এই দম্ভপূর্ণ অস্বাভাবিক যন্ত্রসভ্যতার ভয়ংকর প্রতীক—সহজ প্রাণের গতির এবং যাত্রার পথে ভয়ংকরী বাধার যথার্থ প্রকাশ এবং 'রক্তকরবী' নাটকের সার্থক পটভূমিকা।

সাংকেতিক নাটকে চরিত্র সৃষ্টির আংগিক প্রচলিত নীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এমন কি বিপরীত মুখে বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। সেকস্‌পীয়র এবং তাঁর অনুবর্তী নাট্যকারগণ চরিত্র সৃষ্টিতে ব্যক্তি-সত্তার উপর জোর দিয়েছেন, সেখানে ব্যক্তিরূপেরই প্রাধান্য। কোন ভাব, আদর্শ, নীতি বা প্রবৃত্তির প্রাণান্তকারী একাধিপত্য চরিত্রের প্রধাণ গুণ বা দোষ হ'লেও তারা ব্যক্তিরূপের প্রকাশকেই উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, তাকে ক্ষুণ্ণ বা বিলুপ্ত করতে পারেনি। ম্যাকবেথে অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষার উৎকট প্রকাশ ঘটেছে তবু ম্যাকবেথকে কেউ অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলতে সাহস পাবে না। এ্যান্টনির সর্বনাশা মোহের বা কামনার দুর্ধর্ষতা তার ব্যক্তিসত্তাকে নিশ্চয়ই গলাটিপে মারতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের বিক্রমদেব, রঘুপতি প্রবৃত্তির বা সংস্কারের সর্ববিধ্বংসী একাধিপত্যের দাস হলেও মানুষ, তারা ভাবের প্রতীক নয়। এখানে ব্যক্তি-প্রাধান্য স্বীকৃত, ভাব বা প্রবৃত্তির প্রাবল্য ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বাহন মাত্র। আর এরা একান্তভাবে সজীব, প্রাণবান, এমনই যে অস্তিত্ব-গৌরবে বাস্তব মানুষকে অতিক্রম ক'রে যায়। সংলাপের মধ্যে দিয়ে যেন তাদের হৃৎস্পন্দন-ধ্বনি শোনা যায়,

'If you prick them, they will bleed'—তারা এমনই সজীব। তারা তীক্ষ্ণভাবে বাঁচে এবং প্রচণ্ডভাবে মরতে পারে—এই প্রবৃত্তি সর্বস্ব স্পর্ধিত এবং প্রচণ্ড জীবনবোধই, (Life immense in pulse passion and power') সাধারণ নাটকের চরিত্রসমূহের প্রথম ও শেষ কথা।

কিন্তু সাংকেতিক নাটকে এই নীতি যথাযথ অনুসৃত হয়নি। এখানে ব্যক্তি ভার প্রকাশের বাহন, ব্যক্তিসত্তা অনেকাংশে বিলুপ্ত। ভাবকে, তত্ত্বকে নাটকীয় চরিত্ররূপে প্রকাশ করবার জন্য ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক, জড়বাদ বা সাম্রাজ্যবাদ একটি ভাব বা তত্ত্ব। এর কোন বিশেষ সত্তা নেই, এ নির্বিশেষ। পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের এবং সর্বমানবের মধ্যে প্রকাশিত জড়বাদ নিয়ে এর একটি রূপ কল্পনা করা যেতে পারে কিন্তু তাকে ব্যক্তিরূপের মধ্যে প্রকাশ করা সহজ নয়। তবে এর সমগ্রতাকে যদি কোন একটি ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ করা যায় তা'হলে জড়বাদের রূপ ফুটতে পারে কিন্তু ব্যক্তিরূপের বিলুপ্তি ঘটবে, কারণ জড়বাদ ও জড়বাদী মানুষ এক নয়। জড়বাদীর মধ্যে তার সহস্র দোষগুণ নিয়ে মানুষ আছে, 'সুখ দুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি যার' কিন্তু জড়বাদের সমগ্ররূপের মধ্যে মানুষ নেই। জড়বাদের ভাব বিগ্রহ তাই আমাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন আনে, হতবুদ্ধি ক'রে তোলে কিন্তু মুগ্ধ করতে পারেনা। উপমা যুক্তি নয় তবু উপমার সাহায্যে কথাটিকে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া যায় ; জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য শুভ্র নিরঞ্জন, তাকে আমরা সহ্য করতে পারিনে। তাকে আমাদের প্রয়োজন সত্য—কিন্তু তা আমাদের মুগ্ধ করেনা কিন্তু সেই জ্যোতিঃস্বরূপ যখন বর্ণগরিমায় প্রকাশ পায় তখন নয়ন মন মুগ্ধ হ'য়ে যায় এবং তা আমাদের অনুভূতির ক্ষেত্রে আলোড়ন আনে, আমরা তাকে ভালবাসি। পূর্বেকার নাটকের চরিত্রসৃষ্টিতে এই ভাঙাচোরা আলোর বর্ণচ্ছটা আছে—সহস্র বিরুদ্ধ-শক্তি দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত—ভাব,

তত্ত্ব বা আদর্শের ভাঙাচোরা রূপ আছে তাই তাদের ভাল না বেসে পারা যায় না আর সাংকেতিক নাটকে নিছক ভাবরূপের সমগ্রতা দেখে আমরা হতবুদ্ধি হ'য়ে যাই। ভাব বা তত্ত্বমূলক সাংকেতিক নাটকের বিপদ এইখানে। এখানে চরিত্রসমূহ যথেষ্ট প্রাণবান নয়। অবশ্য সব চরিত্র সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নাও হ'তে পারে তবে সাধারণভাবে একথা সত্য। এখানে তত্ত্বরূপকে বা ভাবসত্তাকে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করা হয়, এখানে ভাবই প্রধান, ব্যক্তি নয়। অতএব এই ধরণের নাটকের চরিত্রসৃষ্টি যে পূর্বেকার ধারার বিপরীত মুখে তা বোধ করি বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের চরিত্রগুলি যে বিশেষ ভাব বা নীতির প্রতীক তা ধরা যায়, ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তা বিলুপ্ত না হ'লেও কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য তাঁর মত মহাকবির সৃষ্টিতে এর যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে; কারণ "রক্তকরবী"র বিশু, "রাজা" নাটকের সুদর্শনা প্রভৃতি যে ভাববিগ্রহ তা যেন ভুলে যেতে হয়— এরা এমনই সজীব। এরা আমাদের শুধু মুগ্ধই করে না, অনুভূতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং ফলে নাটকের উদ্দেশ্য সার্থকতার দিকে এগিয়ে যায়।

রক্ত-করবীর বিশু পাগল

রক্ত-করবীর কেন্দ্রস্থলে নন্দিনী বিশ্বরুচী অগ্নিশিখার মতই দ্যুতিময়ী। তাকে ঘেরে যক্ষ-পুরীর জীবন আবর্তিত, উদ্বেল এবং দ্রুত পরিণাম মুখে ধাবিত। তাকে দেখে কেউ পেয়েছে ভয়, কারও জেগেছে বিস্ময়! কেউ উন্মত্ত অধীরভাবে নিঃশেষে আপনাকে দান করে হয়েছে কৃতার্থ, দুঃখের সাধনায় মগ্ন হ'য়ে মুক্তির সন্ধানে ফিরেছে, কেউ বা আবার প্রলয়ের বহ্নি-শিখার মধ্যে জীবনের মহিমা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছে। স্বয়ং যক্ষরাজ থেকে—সামান্য সর্দার পর্যন্ত তাকে দেখে বিচলিত, বিক্ষিপ্ত-চিত্ত। তাদের সম্পূর্ণ অগোচরেই জীবনের চিরাচরিত বন্ধনমূল কেমন করে শিথিল হয়ে গিয়েছে। নন্দিনীকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। দীপ্তানলার্ক-দ্যুতি প্রাণ-শক্তিকে কে কবে অস্বীকার করতে পারে? সকলেই তাই জেগে উঠেছে—নন্দিনী যে ঘুম-ভাঙানিয়া এবং জেগেছে দুঃখে, সে যে 'দুখ-জাগানিয়া'।

রঞ্জনকে কিন্তু এমন করে জাগতে হয়নি। নন্দিনীকে সে সহজে পেয়েছে; সাধনা তার দুঃখব্রত নয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে বরণ করেছে মৃত্যু; কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষ যে। মৃত্যু তার কাছে জীবনেরই মত অর্থময় অথবা অমৃতেরই রূপান্তর। কবির ভাষাতেই বলি, তার কাছে,

মৃত্যু ভেদ করি
অমৃত পড়ে ঝরি।

আনন্দের সাধনা তারা আনন্দের সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করতে পারে, প্রাণের পূর্ণ অধিকার তারই। তাই প্রাণ-স্বরূপিনী নন্দিনী তাকে সহজে ধরা দিয়েছে।

বিশুও নন্দিনীকে পেয়েছে কিন্তু তার সাধনা সম্পূর্ণ ভিন্নপথে। পৃথিবীতে দুই ধরণের সাধক দেখা যায়। এক ধরণের সাধক

আছেন, প্রাক্তন সংস্কারের মত, পূর্ব জন্মের সুকৃতির মত, মুক্তি যাঁদের অনায়াসলভ্য, তাঁদের আর নূতন করে সাধনা করতে হয় না, তাঁরা যেন নিত্যবুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত। আর অন্য ধরণের যাঁরা তাঁরা মুক্তির তীব্র আকাংক্ষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মুক্তিকে লাভ করতে হয় দুঃখসাধ্য কঠোর তপস্যার মাঝ দিয়ে। বিশু শেষোক্ত শ্রেণীর সাধক। বেদনার সমুদ্র অতিক্রম ক'রে সে আনন্দলোকের ডাঙ্গা দেখতে চেয়েছে এবং তা পেয়েছে—অর্থাৎ বেদনার সাধনা-পথেই সে একদিন আনন্দ সমুদ্রের উপকূলে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে নন্দিনীর পাগল ভাই, নন্দিনীকে গান শোনানই তার কাজ। জীবনের দুঃখ-সুখের মালায় জীবনের অর্ঘ্য রচনা করে নন্দিনীর চরণতলে দান করেই বুঝি তার তৃপ্তি। দুঃখ সে পেয়েছে—ভালবাসার অন্তহীন দুঃখ। প্রথম জীবনে সে নন্দিনীকেই ভালবেসেছিল, কিন্তু তাকে পায়নি, কারণ, "সে রঞ্জনের ও পিঠ; যে পিঠে আলো পড়ে না।"—সে "অমাবস্যা।" "প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ ক'রে হার জিতের খেলা খেলে" রঞ্জন যখন সহজেই তাকে জয় করে নিলে তখন বড়ো অভিমানেই সে পথে বেরিয়ে পড়ল। তারপরে তাকে বিভ্রান্ত করলে একটি মেয়ে। নন্দিনীকে না-পাওয়ার বেদনাময় ভূমিকায় সব-হারানোর মহাক্ষণে অস্তরবির কোমলাভ আলোকতলে তার জীবনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। তার কাছে নিজের অবহেলিত পৌরুষের স্পর্ধা দেখবার জন্য সে সহজেই দিল ধরা। কিন্তু ঘোর যখন ভাঙ্গল তখন বুঝতে পারল, সে ভুল করেছে, কাঞ্চন হারিয়ে কাঁচ দিয়ে নিজেকে ভোলাতে চেয়েছে। তাই নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলতে শোনা যায়, "তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়; মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তারপরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।" বিশু অবশ্য নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল। জাগ্রত-প্রাণ বিভ্রান্ত হ'তে পারে তাই বলে নিঃশেষে আপনাকে হারাবে কেন? না-পাওয়ার বড় বেদনা তাকে বড়-পাওয়ারই সন্ধান দেয়। তাই সেই বলতে

পারে, "কাছের পাওনা নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাংক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের।" সে যাত্রা করে ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম পথে। আর নন্দিনীকে বলে, 'তোর সেই কিছু না-দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব।' প্রেমের তপস্যায় দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে সে যে লাভ করেছে খাঁটি সোনা। বেদনা তাকে বড় করেই বেজেছিল, কিন্তু যখন সে হৃদিরক্তে রাঙা অভিজ্ঞতার পথটি পার হয়ে এল তখন সেই বেদনা তাকে বাজিয়ে তুলল। মুগ্ধ-হৃদয় সুরের মূর্ছনায় ফেটে বের হয়ে এল. জীবনে বেদনার মহিমা এমনই। মন দিয়ে যাকে পেল না, 'গান দিয়ে তার ছুঁয়ে যাওয়ার' সাধনায় সে মগ্ন হল। বাস্তবে যাকে—হারাল সেই তো 'স্বপন-তরীর নেয়ে' হয়ে জীবনের নূতন পর্বে দিল ধরা। নন্দিনীকে সে তো হারায়নি, তার "চিরদুঃখের দূরের আলোটি" নন্দিনীর মধ্যেই তো প্রকাশিত। নন্দিনীর মুখের দিকে চেয়ে পরম বেদনায় সে আপনাকে খুঁজে পেয়েছে, আপন জ্যোতিঃ-রূপের সন্ধান পেয়েছে, "এমন সময় তুমি আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনও আলো দেখা যাচ্ছে।" এ সেই "তোমার চেনার আলোক দিয়ে চিনি আপনারে।" বিশুর আলো আর কিশোরের আগুন—একই কথা। আসল কথা কিশোরও জেগেছে' আর বিশুও জেগেছে; তবে কিশোর যা জানে না, বড় দুঃখে বিশু তা জেনেছে। তমসঃ পরস্তাৎ আলো দেখেছে বলেই সে নন্দিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে পারল, "কিশোরের মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কি চাই?" এ কার কথা? এ তার কথা যে ভোগবতী পার হ'য়ে আনন্দলোকের ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছে। এ তার কথা যে জানে হাতে হাতে পাওয়াটাই একমাত্র বড় পাওয়া নয়, যে জানে হারানোর কি অপূর্ব মহিমা।

নন্দিনীই কি তাকে ভুলতে পেরেছে? না, পারেনি। তাই

বললে, "যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে, বুঝতে পারলুম না।—তারপরে কতকাল খোঁজ পায়নি। কোথায় তুমি গেলে বল তো?" পরে যক্ষপুরীতে যখন তার খোঁজ পেলে তখন দেখলে দুঃখ বেদনার আঘাতে বিশুর হৃদয়খানি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, যার মাঝ দিয়ে চোখে পড়েছে বাইরের আকাশ, দূরের আলো। সে যেন নন্দিনীর প্রাকার, তার কাছে এসে উঁচুতে উঠে—সে বাইরের আভাস পায়—বদ্ধ গড়ের ভিতর চিরদিনকার আকাশ-খানা যে মরে যায়নি তা সে উপলব্ধি করতে পারে—দৃষ্টি তার অবারিত। যক্ষপুরীর রঞ্জনহারা বদ্ধভয়ংকরতার অন্ধকারে এই আকাশখানার প্রয়োজন ছিল আর প্রয়োজন ছিল গানের। এই গানের তরী বেয়েই নন্দিনী যক্ষপুরীর বদ্ধতার অন্ধকার পার হল। রঞ্জনহীন বিরহ-অমানিশার মধ্যে গানের বিদ্যুচ্চমকেই নন্দিনীকে দিলে অভয় মন্ত্র—রঞ্জনের জন্য সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অন্তহীন শক্তি।

এই পর্যন্ত বিশুর ব্যক্তিগত জীবনের কথা। দুঃখের তপস্যায় সে সিদ্ধিলাভ করলে—মুক্তির সন্ধান পেলে। কিন্তু এইখানেই তার জীবনের দ্বিতীয়পর্বের সূচনা। এইবার সে বিশ্বগত জীবনে কর্মবন্যায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। মুক্তি তার কাছে কর্মবিরতি বা সমাপ্তি নয়—বৃহত্তর ক্ষেত্রে কর্মের জন্য আত্ম-প্রস্তুতি। ইতিহাসের দূর প্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত ক্ষেত্রে বিচিত্র ও প্রবল কর্ম-প্রচেষ্টায় মুক্ত পুরুষকে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। যা অন্তরের গভীরে আছে বৃহৎ বিশ্বে তাকে ব্যাপ্ত করতে, উপলব্ধি করতে হয়। এই জগতে কর্ম করেই বাঁচতে হবে।

ঈশোপনিষদে আছে ঃ—

[১] কুর্ব্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

কথাটি একান্ত সত্য। কর্ম থেকে বিরত হ'য়ে জগৎব্যাপী বৃহৎ

---

[১] ঈশোপনিষৎ—২

জীবন-প্রবাহ এড়িয়ে গেলে চলবে না। নিশ্চেষ্টতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে মুক্তির সার্থকতা নেই। নিষ্কাম কর্মে আত্ম নিয়োগ করতে হবে নতুবা মুক্তির প্রয়োজন কি? বৃহৎ মানব সম্প্রদায়ের জন্যই মুক্তির প্রয়োজন। অন্যথা এই মুক্তি অর্থহীন—অধ্যাত্ম-জীবনের স্বার্থ-কেন্দ্রিক বিলাস মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে তাই জীবন্মুক্ত পুরুষেরও কর্মের বিধান আছে। স্বার্থের আবর্ত, সাম্রাজ্য-ক্ষুধিত বর্বরতা, প্রচণ্ড মোহ প্রতি মুহূর্তে জীবনকে গ্লানিময় ক'রে তোলে, তাকে গ্লানিমুক্ত করে অবারিত বিকাশের অন্তহীন পথে প্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্য মানুষকে অভয় মন্ত্র শোনানো চাই আর এই অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্যই মুক্তির প্রয়োজন। অভয় না হ'লে যে কর্মে অত্মনিয়োগ করা যায় না।

দুঃখের সাধনাই বিশুকে সত্যের মহাসম্পদ এবং অকুণ্ঠ সত্যভাষণের পরম নির্ভরতা দান করলে। যক্ষপুরীর নিরেট নিরবকাশ গর্তের জীবনের মধ্যে—সে করলে বিপ্লবের সূচনা, উচ্চারণ করলে ঋজুমুক্ত শুভ্র জীবনের জয়ধ্বনি। ফলে সহস্র নির্যাতন সহ্য করে সে হল বন্দী। এবার প্রচণ্ড মারের মাঝ দিয়ে তার যাত্রা। কিন্তু সে ভয় পায়নি। 'সে বলেছে সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি—এ বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।' সে যেন সেই মহাবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছে ঃ—

তোর চেয়ে আমি সত্য, এ-বিশ্বাসে
প্রাণ দিব দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য সত্য সেই
চিরন্তন এক।

ব্যক্তিগত জীবনে যে মুক্তি পেয়েছিল, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তাকে যেন সে পরখ করতে চাইলে এবং বিপ্লবের প্রত্যাঘাতের মাঝ দিয়ে মুক্ত আত্মার দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রেয়ম মহাবৈভবকে প্রকাশ করে দিলে। কি তার মহিমা! নন্দিনী মুগ্ধ হ'ল, কিশোর অভয় মন্ত্র

লাভ করলে। তাদের কাছে বিদায় নেবার সময়ে সে কিশোরকেই—রঞ্জনকে এগিয়ে আনার মহাকর্তব্যভার দান করে গেল, কারণ সে জানত যে কিশোরই সেই দুঃসাহসী যে মহাবিপ্লবাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিতে ভয় পাবে না। নন্দীনিকে স্মরণ করিয়ে দিলে, নীলকণ্ঠের পালক রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দিতে হবে। "নীলকণ্ঠ কথাটি অর্থহীন হয়। তারপরে মাঠের লীলা শেষ হল, ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল নিয়ে ঘরে চলল।" সত্যই এবারকার ফসল পাকা। আর বিড়ম্বিত হবার সম্ভাবনা নেই।

তারপরে এসেছে চরম বিপ্লবের মহাক্ষণ, শেষ ভাঙনের পালা। জালাবরণ ভেদ ক'রে রাজা বেরিয়ে পড়েছেন,—ভেঙে পড়েছে তাঁর ধ্বজা, তাঁর দণ্ড। নিজের অনাসৃষ্টিকে ভেঙে ফেলবার জন্য নন্দিনীর হাতে হাত রেখে তিনি মেতে উঠলেন ধ্বংসের মহাতাণ্ডবে। জড়ের বিরুদ্ধে, শোষণ-সঞ্চিত অভ্রভেদী স্বর্ণস্তূপ, যা জীবনের কংকাল-পরিণাম সম্ভব করেছে তার বিরুদ্ধে, এমন কি নিজের বিরুদ্ধেই ঘোষিত হ'ল প্রচণ্ড সংগ্রাম। মরবার অর্থ দেখতে পেয়ে তিনি যেন চিরকালের জন্য বেঁচে গেলেন এমন সময়ে আর একবার শেষ বারের জন্য শেষ ভাঙনের ধারে ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বিশুপাগল এসে দাঁড়াল—এবার লগ্ন তার একলা মহাযাত্রার। ভাঙনের মাঝে দাঁড়িয়ে সে নন্দিনীর জয়ধ্বনি উচ্চারণ করলে। প্রলয়ের মাঝ দিয়ে যে নবসৃষ্টির যাত্রা এ যেন তারি ইঙ্গিত। জয়ধ্বনি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেলে ধূলাবলুণ্ঠিত রক্তদ্যুতি-মনোহর রক্ত-করবীর আভায় তার শেষ পথ—একলা মহা-যাত্রার পথ আলোকিত হয়ে উঠেছে। সে কুড়িয়ে নিলে জীবনের এই পরম পাথেয়। শূন্যতা যদি কোথাও থেকে থাকে আজ তা পূর্ণ হয়ে উঠল। মুক্তি পথযাত্রীর ললাটে প্রাণলক্ষ্মীর পরম আশীর্বাদের মতই রক্ত-করবীর গুচ্ছ দিলে জয়টীকা পরিয়ে। নন্দিনী হাতখানি রিক্ত করেই তাকে দান করে গেল, তাই বিশুর সমস্ত রিক্ততা আজ ভরে উঠল। এমনি করে চির-আকাংক্ষিতার শেষস্পর্শ নিয়ে সে চলে গেল।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকে ঠাকুরদার যে স্থানটি আছে বিশুপাগল এখানে সেই স্থানটি গ্রহণ করেছে। সে তেননি সদানন্দ, স্বচ্ছদৃষ্টি ও মুক্তি-প্রয়াসী। দুঃখবেদনার অভিজ্ঞতার পারে সে আনন্দলোকের ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছে—তাই সে পেয়েছে মুক্তির সন্ধান—দিয়েছে জীবনের আশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্ববিধানের স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্ববিধানের স্বরূপ কী অর্থাৎ তাঁর রচনায় এই স্বরূপ কেমন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই প্রবন্ধে তা আলোচনা করা হবে। বিষয়টি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। কোন ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তা সম্যক আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষেপে আলোচ্য বিষয়ের ভূমিকা রচনা করা হবে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ কবি, বিচিত্রের রূপকার, শুভ্র নিরঞ্জন অযুত বর্ণালোকে তাঁর রচনায় সমুদ্ভাসিত। কিন্তু বর্ণের মোহাঞ্জনে তাঁর দৃষ্টি এবং সৃষ্টি অভিলিপ্ত হলেও যিনি 'একোহবর্ণঃ' অর্থাৎ এক এবং অবর্ণ তাঁকে তিনি ভুলতে পারেননি। বহু কবিতায় এই মহান এক-এর উপলব্ধির বাণীরূপ আছে।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিনী। (চিত্রা)

নীল গগনে অযুত আলোকে যিনি ঝলসিত, ফুল কাননে আকুল পুলকে যাঁর উল্লাস এবং দ্যুলোকে ভূলোকে চলচরণে যাঁর বিলাস সেই চঞ্চল গামিনী কিন্তু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপের মধ্যেই সম্পূর্ণ নন। রূপকে অতিক্রম করে তাঁর সত্তা সেই অতলে মগ্ন রয়েছে যেখানে, নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি, তুমি অচপল দামিনী।' যিনি চঞ্চল গামিনী তিনিই অচপল দামিনী। শুধু যে সৌন্দর্যের মধ্যেই এই নিগূঢ় সত্তা আপনাকে নানারূপে নানা ছন্দে নিত্য বিকশিত করে তুলেছেন তাই-ই নয় দুর্যোগের মায়ার আড়ালে, কষ্টের বিকৃত ভানে, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত তাদের মধ্যেও তাঁর নিত্য স্থিতি—তাঁরই ছলনার ভূমিকা ঃ—

'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের—
মায়ার আড়ালে। (আরোগ্য—১)

অথবা

'কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।' (শেষ লেখা—১৪)

অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। এর থেকে একটি কথা সুস্পষ্ট যে সৃষ্টির অন্তরালে এক নিত্য সত্তা বিরাজিত রয়েছেন। উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করি :—

[১]য একোহবর্ণে বহুধা শক্তি যোগাদ—
বর্ণানেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি অদ্বিতীয় ও নির্বিমেষ, যিনি অজ্ঞাত প্রয়োজনে নানা শক্তি সহায়ে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে অনেক প্রকার শব্দার্থ বিধান করেন, লয়কালে যাহাতে বিশ্ব বিলীন হয় এবং স্থিতি কালে যাহাতে অবস্থান করে তিনি বিজ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি যুক্ত করুন।

অথবা

[২]ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে সেই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়।

অথবা

[৩]বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক—
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

"যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে নিজ প্রকাশাত্মক

[১]শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।১
[২]ঈশোপনিষৎ ১
[৩]শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।৯

মহিমায় বিরাজিত সেই পুরুষের দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত।" এই সব উক্তির সঙ্গে নিম্নোক্ত কাব্যখণ্ডের একান্ত সাদৃশ্য রয়েছে।"

'শুধু জানি, তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চল প্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে
তারি বিশ্ব-বিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেম মূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জন মুখে।' (এবার ফিরাও মোরে)

প্রথমোদ্ধৃত কাব্যখণ্ডগুলিও এ স্থলে স্মরণীয়।

আশ্চর্যের কথা, এই অনুভূতির সঙ্গে বিদেশীয় কবি শেলীর Hymn To Intellectual Beauty কবিতার অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় :—

Spirit of Beauty that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or from where thou art gone?

শেলী এই একান্ত ভারতীয় অনুভূতি কোথায় পেলেন? যাক্ সে কথা। রবীন্দ্রনাথ আপাত বৈচিত্র্যের অন্তরালে এই নিত্য সত্তা—মহান একেকে ধ্যানের মধ্যে ধরতে চেয়েছেন। তাই তাঁর প্রার্থনা, অপাবৃণু—

[১] হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

*   *   *   *

সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং
তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ যোঽহমস্মি।

---

[১] ঈশোপনিষৎ ১৫, ১৬

'হে প্রভাত সূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল
প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত।
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরন্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও—
পরাহত রজনীর অপমান সহ। (রোগ শয্যায়—১৫)

অথবা

করো করো অপাবৃত ; হে সূর্য আলোক আবরণ
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ। (জন্মদিনে—১৩)

অথবা

হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
কর অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আমারে
মৃত্যুর অতীত। (জন্মদিনে—২৩)

এ অপূর্ব কাব্য-খণ্ডগুলি শুধু নিছক অনুবাদ নয়—সাধক কবির সত্যাপলব্ধির সার্থক বাণীরূপ। সৃষ্টির বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে এক জ্যোতির্ময় সত্তা রয়েছে যার সঙ্গে পরম যোগে কবির জীবনেরও সার্থকতা, এই সব কবিতায় তা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন যে একেরই বিচিত্ররূপ নিয়ে বিশ্বসৃষ্টির শোভাযাত্রা। তাই কবি বিচিত্রের রূপকার হয়েও একের সাধক :—

একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রে নর্মবাঁশি, এই মোর রহিল প্রণাম। (প্রণাম)

কিন্তু এই একের সঙ্গে বিচিত্রের সম্পর্ক কি? এক যদি অখণ্ড ও পূর্ণ হয় তাহ'লে বিচিত্র কি অপূর্ণ ও খণ্ডিত? এই প্রসঙ্গে কবি-বচন উদ্ধৃত করা যাক্‌ঃ

[১]"বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে যেটা আসন্ন, সেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না। তাহাকে এ-কথা জানিতে দেয় না যে সে একটা সোপান-পরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তখন মনে হয় ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য—এমনি তাহার সৌন্দর্য, এমনি তাহার সুগন্ধ যে মনে হয় সে বন-লক্ষ্মীর সাধনার চরম ধন—কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্য মাত্র, সে-কথা গোপনে থাকে—বর্তমানের গৌরবেই যে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ-কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।"

এই আলোচনায় প্রকাশিত যে সৃষ্টির প্রতিটি স্তর স্বয়ংপূর্ণ হয়েই (চরমতা রক্ষা করিয়াই) পূর্ণতার অর্থাৎ পরম পরিণামের দিকে ধাবিত। উপনিষদের—

[২]ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

ওঁ উহা (পরব্রহ্ম) পূর্ণ, ইহাও (নামরূপস্থ ব্রহ্মও) পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদগত হন; পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে, পূর্ণই (পরব্রহ্মই) মাত্র (অবশিষ্ট থাকেন।)—রবীন্দ্রনাথের উক্তি কি এই বাণীরই প্রতিধ্বনি নয়?

[১] আত্মপরিচয়—১
[২] উপনিষৎ—শান্তিপাঠ

প্রশ্ন জাগে এই যে এক-এর প্রকাশের রূপটি কি? উত্তরে তিনি বলেছেন—এর রূপ হচ্ছে 'আনন্দম্'। 'আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।'

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর
দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ। (রোগ শয্যায়—২৫)

তাহ'লে জগতে কি দুঃখ নেই? অস্বীকার করা চলে না যে দুঃখ আছে। আর দুঃখ স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে কি এই মহান এক খণ্ডিত হয়ে পড়ে না? আপাতঃ দৃষ্টিতে খণ্ডিতই মনে হবে কিন্তু কবির দৃষ্টিতে দেখলে তা খণ্ডিত মনে হয় না। তাঁর কাছে আনন্দ ও দুঃখ পরস্পর বিরোধী নয়—

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ-জীবন
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

আনন্দ ও দুঃখ বস্তুতঃ একই সত্যের ভিন্ন দুইটি দিক্। উপনিষদের ঋষিও এই সত্য উপলব্ধি করেছেন—

[১]আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

সৃষ্টির মূলে এখানে দেখি আনন্দম্। আবার এই উপনিষদের মধ্যেই আছে—স তপোঽতপ্যত—তিনি তপস্যা করলেন। একদিকে আনন্দের সত্য,—অন্য দিকে তপস্যার অর্থাৎ দুঃখের সত্য, এক অন্যের রূপান্তর। মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য এখানে যে দুঃখের কথা বলা হচ্ছে তা মানুষের সৃষ্ট নিছক খাওয়া-পরার দুঃখ নয় তা বিশ্ব-বিধানের সহিত জড়িত সহজ ও স্বাভাবিক দুঃখ। "এই দুঃখ-সম্পদই

---

১ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।৬

মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্য। এই দুঃখের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই দুঃখের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্যকে লাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' অর্থাৎ দুঃখ স্বীকার করিবার বল যাহার নাই যে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।"[২]

"সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়া ছিলেন, আনন্দ তেমনি করিয়াই দুঃখকে অনায়াসে গ্রহণ করে। এমন-কি দুঃখের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা।"[৩] —এই-ই দুঃখের নবগীত। এই দৃষ্টিতে বলে, দুঃখ তো জীবনে বাধা নয়ই পরন্তু জীবনের সহায়ক, তা জীবনকে পূর্ণতা দান করে—গতিমান করে তোলে।

দুঃখের সঙ্গে একান্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে রয়েছে ভয়াবহ দুঃখ—মৃত্যুর কথা। এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি দেখা যাক। তাঁর দৃষ্টিতে মৃত্যুও জীবনের পরিপন্থী নয়—পরিপোষক। জীবনের ধারাটি মৃত্যুতে পৌঁছে তাকে পূর্ণতা দান করে মাত্র—তাকে খণ্ডিত করে না। জীবনের এক প্রান্তে জন্ম অন্য প্রান্তে মৃত্যু—নব জীবনের সিংহদ্বার, এ যেন বৃহত্তর যাত্রা পথে বন্ধন ও মুক্তির লীলা,

প্রাণের মুক্তি মৃত্যু রথে
নূতন প্রাণের যাত্রা পথে। (নটরাজ ঋতুরঙ্গ পালা—মুক্তিতত্ত্ব)

তাই মৃত্যু ভয়াবহও নয়—বিরোধীও নয়।

[৪]'হে ভীষণ, দুঃখ বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? হে পিতা,

[২] পথের সঞ্চয়—যাত্রার পূর্বপত্র
পথের সঞ্চয়—দুই ইচ্ছা
ধর্ম—দুঃখ

তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ। হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়, তুমিই—

ভয়াণাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাম্ তুমিই

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান সমগ্রান বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ তেজোভি রাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রা প্রতপন্তি বিষ্ণো—এই উপলব্ধির সমর্থন কল্লে বহু কবিতা উদ্ধৃত করা চলে। নিম্নে কিছু দেওয়া গেল ঃ—

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ তবু অনন্ত, জাগে,

অথবা

এমন একান্ত, করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো
এ দুয়ের মাঝে তবু কোন খানে আছে কোন মিল
নহিলে নিখিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।

(বলাকা—১৯)

অথবা

সে-ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাতো না নিখিল তরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হত
যদি হত মহাসমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ।

(পরিশেষ— মৃত্যু)

অথবা

ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরমদান মরণের বধূ
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।

(রোগ শয্যায়—৩৭)

জীবন ও মৃত্যু বাগার্থবিব সম্পৃক্তৌ পার্বতী পরমেশ্বরৌ। অপূর্ব এ-কবিতা, অনুভূতি এখানে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। ভাষা তো নয়—সবিতার মহাদ্যুতি পরম আবির্ভাব।

[1]"অবসানকে, বিদায়কে, মৃত্যুকে আজ আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জানব—তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জানব—যস্য ছায়াঽমৃতম্ যস্য মৃত্যু।

[2]"সহজেই মনে হয় মৃত্যুই যায় থেমে, মৃত্যুই দেয় থামিয়ে। কিন্তু কোন ঋষির অনুভূতিতে দেখা দিল মৃত্যুই চলে—মৃত্যুই চালায়, সে নইলে স্তব্ধ হয়ে যেত—যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এই চলমান জগতে যা কিছু গতিশীল।"

মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ঃ—মৃত্যুকে নিয়ে কাজ হচ্ছে বিশ্বের ধাবমানতা।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে মৃত্যু এমনই অপূর্ব মোহন মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। সত্যই ত যা জীবনের স্বাভাবিক পরিণাম তা কখনই অন্যরূপ হ'তে পারে না। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁরা জানেন ব্যক্তিগতভাবে তিনি মৃত্যুকে এইভাবেই গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর বোধ করি এই প্রার্থনাই ছিল।

---

[1]শান্তিনিকেতন—বর্ষশেষ
[2]প্রবাসী-বৈশাখ ১৩৪৭

'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে মঙ্গল আলোক
তবে তাই হোক, তবে তাই হোক।'

তাঁর শেষ কবিতা—'তোমার সৃষ্টির পথও কি অনুরূপ সাক্ষ্য বহন করে না? অর্থাৎ রুদ্রের রুদ্রতাই শুধু তাঁর চোখে পড়েনি, রুদ্রতার অন্তরালে দক্ষিণ মুখের প্রসন্ন হাসিটিও তাঁর ধ্যানের গহনে ধরা দিয়েছে। তাই মৃত্যুর ভয়াবহতার সম্মুখে উচ্চারিত হয়েছে অভয় বাণী। জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ বন্ধন-মুক্তি—সবকিছুর অন্তরালে আনন্দময় মহান্ এক-এর উপলব্ধিই এমনটি সম্ভব করে তুলেছে।

বিশ্ববিধানের অন্যতম কঠোর সত্য হচ্ছে পাপ। মানব-জীবনে একে অস্বীকার করবার উপায় নেই। মহাপুরুষেরাও বোধ করি অপাপবিদ্ধ নন। এই পাপ পাপের ক্রিয়া ও পাপমুক্তি সম্প্রর্কে কবি বহুস্থানে আলোচনা করেছেন। 'তপোবন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,—"অংশের প্রতি আসক্তি বশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; এই হ'চ্ছে পাপ, অথবা কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতি আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ।" "ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়। কোন একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড় করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল।' কবির পাপের ধারণা এই আলোচনায় একান্তভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাঁর ট্র্যাজিডিগুলিতে এই পাপের মূর্তি চমৎকার ভাবে নাট্রীকৃত হতে দেখা যায়। অতএব এই প্রসঙ্গে তাঁর নাটক থেকেই উদাহরণ সংগ্রহের চেষ্টা করব।

'রাজা ও রাণী' নাটকে—বিক্রম রাণী সুমিত্রার প্রতি প্রবল আসক্তি-বশত রাজকর্তব্য অবহেলা করেছেন অর্থাৎ সমগ্রের প্রতি বিদ্রোহ করেছেন। এর ফলে ঘটেছে চরম সর্বনাশ। বিসর্জন নাটকে রঘুপতির পাপ অহংকার বা আত্মাভিমান রূপে প্রচণ্ড আকারে জাগ্রত হয়ে মহা অবক্ষয় ঘটিয়েছে জয়সিংহের মৃত্যুতে। মুক্তধারা ও রক্তকরবী

নাটকে অনুরূপ ঘটনাই ঘটতে দেখি। পূঞ্জীভূতা লালসার কলুষের শূলে অকাশের মর্মমূলে সেখানে বিদ্ধ, অহং বোধের (egoism) মূঢ় অন্ধতা সেখানে করুণ পরিণামে অবসিত। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক 'শ্যামা'তেও দেখি শ্যামার প্রবল আসক্তি উত্তীয়ের মৃত্যু ঘটিয়েছে আর নিজের ও দয়িত প্রিয়তমের জীবনে এনেছে দুঃসহ বিচ্ছেদের নিদারুণ দুঃখ। উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তগুলিই আমাদের বক্তব্য সমর্থন করবে অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্রবলতা জনিত সামঞ্জস্য-ভঙ্গেই যে পাপের উদ্ভব এবং তার থেকেই অমঙ্গল— এই সত্য এই দৃষ্টান্তগুলিতে স্পষ্টীকৃত।

পাপের এই ধারণা বোধকরি সর্বদেশের ও সর্বকালের। ব্যাস বাল্মীকির মহাকাব্যে, কালিদাসের কাব্য ও নাটকে এই ধারণাই প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি সমূহে পাপের এই ধারণাই আছে। সমালোচক প্রবর ব্র্যাডলি সেক্‌সপীয়রের ট্রাজেডি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

In almost all (tragidies) we observe a marked one-sidedness, a predisposition in some particular direction ; a total incapacity, in certain circumstances, of resisting the force which draws in this direction, a fatal tendency to identify the whole being with one interest, object, passion, or habit of mind. This, it would seem, is, for Shakespeare, the fundamental tragic trait. (Bradley-Shakespearean Tragedy)

রবীন্দ্রনাথের উক্তির সঙ্গে এই উক্তির মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। ম্যাক্‌বেথের vaulting ambition, ওথেলোর প্রবল ঈর্ষান্ধতা, লীয়রের অহমিকা বা আত্মাভিমান এবং এ্যাণ্টনি ক্লিয়োপেট্রার কামবহ্নি—প্রভৃতিই অহংকার বা ঘনীভূত বাসনা—fatal tendency,

সামঞ্জস্য-ভঙ্গ-জনিত এই মহাপাপ, এরই সুতীব্র আঘাতে জাগ্রত মহাকাল তাদের জীবনে শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি এনেছে। সর্বমত্যন্তং গর্হিতম, এই উক্তিটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই উক্তিটির মর্মকথা অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে শুধু দর্প বা মান নয় অতিদানও গর্হিত অর্থাৎ পাপ। অতি ভালোও ভাল নয়। একটু গভীর ভাবে দেখলেই বোঝা যায় যে এই অতি-তা অর্থাৎ আত্যন্তিকতা অহং বোধেরই আত্যন্তিকতা। অহংটাই সবচেয়ে বড়ো রিপু। এটা প্রবল হয়ে উঠে সমস্ত সামঞ্জস্য ভেঙে চুরমার করে দিয়ে পাপাকারে জাগ্রত হয়ে ওঠে। সৃষ্টির কোথাও এ-নীতির ব্যত্যয় নেই। প্রাকৃতিক জগতে যে বিপর্যয় ঘটে তার মূলেও এই সত্য আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে বিপ্লব আসে তার মূলেও এই সত্য। রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে এই বিপর্যয়ের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন ঃ—

যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে
সদ্য জেগে ওঠে কাল, সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখ দিন।
দুঃসহ উত্তাপে যেথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু, ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেই মতো কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে। (গান্ধারীর আবেদন)

এই আত্যন্তিকতার ভয়াবহ পরিণাম কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ—রাবণের মহানিপাত। এই বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিধান সামঞ্জস্য ফিরে পায়—সংশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

গর্জমান বজ্রাগ্নি শিখায়
সূর্যাস্তের প্রলয় শিখায়
রক্তের বর্ষণে
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে। (বলাকা—১১)

নামে শাস্তি। সেক্‌সপীয়রের নাটকে এই পরিণামই দেখা যায়—তাই তাঁর ট্র্যাজেডি সমাপ্ত হয় নায়কের অপমৃত্যুতে। Evil exhibits itself every where as something negative, barren, weakening, destructive, a principle of death.
(Bradley)

রবীন্দ্র ট্র্যাজেডির পরিণামে কিন্তু ভিন্নতা লক্ষিত হয়। সেখানে পাপী বা দুবৃত্তের কদাচিৎ মৃত্যু ঘটে। পুষ্পোপম পবিত্রহৃদয় অন্য একটি চরিত্র এই পাপকে প্রতিহত বা বিনষ্ট করতে গিয়ে আত্মাহুতি দান করে। রাজা বিক্রমের পাপকে প্রতিহত করবার জন্য কুমার সেন (তপতীতে দেবী সুমিত্রা) আত্মোৎসর্গ করেন, রঘুপতির আত্মাভিমান (পাপ) চূর্ণ করবার জন্য জয়সিংহ দেবীর সম্মুখে নিজের প্রাণ বলি দেন, রক্ত-করবীতে রঞ্জনের স্বেচ্ছামৃত্যু ঘটে এবং মুক্তধারার অভিজিৎ যন্ত্রদানবকে আঘাত করে চিরকালের জন্য ভেসে যায়। বিক্রমদেব, রঘুপতি, রাজা এবং বিভূতির অর্থাৎ যারা পাপী বা দুর্বৃত্ত তাদের মৃত্যু ঘটে না পক্ষান্তরে তাঁদের সত্যোপলব্ধি ঘটে। বিক্রম হন শান্ত। রক্ত-করবীতে রাজা বলেন—"মরতে ত পারব, এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি।" বিভূতির কথা কবি স্পষ্টতঃ বলেননি তবে রণজিতের যে পরিবর্তন ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর তা ঘটিয়ে তুলেছিল সম্পূর্ণ নিষ্পাপ—অপাপবিদ্ধ কুমার সেন জয়সিংহ, রঞ্জন ও অভিজিৎ। একজনের মৃত্যুবরণ অপরকে অমৃতের সন্ধান দান করে—রবীন্দ্রনাথের বহুনাটকে এই তত্ত্বের আভাস মেলে।

সেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজিডিতে নায়কের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য মৃত্যুর চরম মুহূর্তে তার অন্তরের ঐশ্বর্য অপ্রত্যাশিত ভাবে ঝলকিত হয়ে ওঠে। ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো, লীয়র, এ্যান্টনি, ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে একথা নিশ্চিত সত্য, তবুও দৈহিক মৃত্যুর হাত থেকে তাদের রেহাই থাকে না। রবীন্দ্র ট্র্যাজেডিতে দুর্বৃত্ত বা পাপী প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ পায়। একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুবরণ তাকে সত্যোপলব্ধিতে সহায়তা করে, তাকে আত্মস্থ

করে। এতে করে হয়তো ট্র্যাজিক অনুভূতির গভীরতা নষ্ট হয় কিন্তু জীবনের নূতন রূপ চোখে পড়ে—দুর্বৃত্ত সর্বগ্লানিমুক্ত হ'য়ে হারানোর ভূমিকায় জীবনের পরম ও পূর্ণ মহিমাকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে যাদের নিষ্পাপ জীবন আত্মোৎসর্জন করে তাকে মুক্তি দান করলেন তাঁদের জীবনের সার্থকতা কোথায়? তার উত্তরে বলা হয় যে এঁরা অহিংসাব্রতী, সত্যাগ্রহী, নিত্যবুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত পুরুষ। এঁদের কাছে মৃত্যু ও অমৃতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এঁদের দৃষ্টিতে।

'মৃত্যু ভেদ করি অমৃত পড়ে ঝরি।'

এঁরা পাপীদের তারণ করবার জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

প্রাণোৎসর্গ করে পাপীর মুক্তি-সাধন করা অথবা তাকে মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করার এই আদর্শ খ্রীষ্ট প্রবর্তিত জীবনাদর্শের অনুরূপ। তিনি পরিত্রাণকর্তারূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং নিষ্ঠুরতম মৃত্যু বরণ করে পাপীর মুক্তি আনতে চেয়েছিলেন। একেই যথার্থ সত্যাগ্রহ বলে। অহিংসার দ্বারা হিংসাকে প্রতিরোধ করা, প্রাণ দিয়ে প্রাণকে জাগানো—মোহমুক্ত করা সত্যাগ্রহীর প্রকৃত আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিগুলি এই সত্যাগ্রহ আদর্শের অপূর্ব বাণীরূপ। এই প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য চোখে পড়ে, খ্রীষ্ট ছিলেন মানব-পুত্র—সত্যকুল জাত। রবীন্দ্র-নাটকের এই নিষ্পাপ মানুষগুলিও মানব-পুত্র—এঁরা ব্রাত্য। এঁদের পিতৃ ও কুলপরিচয় নাটকে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অন্ততঃ জয়সিংহ, অভিজিৎ ও রঞ্জন সম্বন্ধে এ-উক্তি সহজেই করা চলে। লক্ষ্য করবার কথা, রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত এই সত্যাগ্রহ আদর্শ পরবর্তীকালে ভারতীয় জীবনে কি বিপুল রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং বিশ্বে নবজীবনবোধ সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই চরিত্রগুলির নির্বিশেষের বিশেষরূপ। দেশ কাল ও জাতির উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই কি তিনি এই রীতি

অবলম্বন করেছেন ? বস্তুতঃ এঁরা বিশ্ববিধানের অন্তর্নিহিত মঙ্গল-শক্তির সজীব বিগ্রহ।—বিশ্ববিধানকে পাপ বা গ্লানি থেকে মুক্ত করবার জন্যই এঁদের অপরাজেয় আবির্ভাব—এঁরা চিরজীবিত মহাজাতক, বিশ্বজাগতিক, দেশ কালের উর্ধ্বে এঁদের মহাপ্রতিষ্ঠা। এঁরা গীতোক্ত বাণীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ কি মনে করেন যে বিশ্বমানবের সত্যোপলব্ধির পথে জাতি ও কুল বাধার সৃষ্টি করে ? তাই হিন্দুধর্মের আচার ও সংস্কারের গণ্ডী পার হ'য়ে অহিন্দু গোরাই ভারতবর্ষের সত্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন ?

পাপ সম্বন্ধে এইবার শেষ প্রশ্ন ওঠে ? পাপ কি বিশ্ববিধানের বাহিরের বিরোধী সত্য ? আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে দুঃখ বা মৃত্যু আপাতবিরোধী মনে হলেও তা বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধ নয়। তা বিশ্বের ধাবমানতা রক্ষা করছে—মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তা মহান এক-এরই ভিন্নতর সত্তা। কিন্তু পাপ কি ? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আমি এই প্রসঙ্গে তাঁর রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি করছি ঃ—

"হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড় হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায় ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নবনব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল।" (বিচিত্র প্রবন্ধ – পাগল)

অথবা

"যেটুকু আমার কাছে তাহার চেয়ে বেশি লইতে গেলেই সেটুকু তোমার কাছে তাহার উপর হাত দিতে হয়। তখন হয় গোপনে ছলনা নয় প্রকাশ্যে গায়ের জোর আশ্রয় করিতে হয়। তখন দুর্বলের মিথ্যাচার ও প্রবলের দৌরাত্ম্যে সমাজ লণ্ডভণ্ড হইতে থাকে।

এমনি করিয়াই পাপ আসে, বিনাশ আসে। কিন্তু এই পাপ যদি না আসিত তবে মানুষ পথ দেখিতে পাইত না।"

(পথরে সঞ্চয়—দুই ইচ্ছা)

প্রথম অংশের "মহাপুণ্য ও মহাপাপ" এবং ভালোমন্দ কথাগুলি লক্ষনীয়। বিশ্বপ্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখার এবং নবনব মূর্তিতে প্রকাশ করার জন্য উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অথবা

"কিছুই থাকে না এইটে যখন জানি তখন পাপকে দুঃখকে ক্ষতিকে আর একান্ত বলে জানিনে। দুর্গতি একটা ভয়ংকর বিভীষিকা হয়েই উঠত যদি জানতুম সে যেখানে আছে সেখান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি, সমস্তই মরছে এবং সেও মরছে, সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনন্ত চলার মাঝখানে পাপ কেবল একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেখান থেকে সে এগোচ্ছে। আমরা সব সময়ে দেখতে পাইনে, কিন্তু সে চলেছে। ওইখানেই তার পথের শেষ নয়—সে পরিবর্তনের মুখে সংশোধনের মুখেই রয়েছে। (শান্তিনিকেতন—বর্ষ শেষ)

ব্র্যাডলি সেক্‌সপীয়রের ট্রাজেডি আলোচনা প্রসঙ্গে evil বা পাপ সম্বন্ধে অনুরূপ প্রশ্ন তুলেছেন।

The evil against which it (world order) asserts itself and the persons whom this evil inhabits are not something outside the order, so that they can attack it or fail to conform to it, they are within it and a part of it. It itself produces them—produces Iago as well as Desdemona, Iago's cruelty as well as Iago's courage. It is not poisoned but poisons itself. Doubtless it shows by its violent re-action that the

poison is poison and that its health lies in good. But one significant fact cannot remove another and the spectacle we witness scarcely warrants the assertion that the order is responsible for the good in Desdemona but Iago for the civil in Iago.

ইয়াগো ভারতীয় হলে বলতে পারতেন—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষিকেশঃ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে এক চৈতন্যময় সত্তা নিত্য বিরাজিত থেকে এই প্রবাহ ভালোমন্দ, পাপ, পুণ্য, দুঃখ মৃত্যুর মাঝ দিয়ে বৃহত্তর তাৎপর্যের অভিমুখে বহন করে নিয়ে চলেছেন। এই প্রবাহের স্বরূপ কবির ভাষায় বলি ঃ—

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও,
কুড়ায়ে লও না কিছু করো না সঞ্চয়
নাহি শোক, নাহি ভয়
পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়। (বলাকা চঞ্চলা)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	শুদ্ধ
১৩	শেষ পংক্তি	যা	যায়।
১৫	৮	মাটকের	নাটকের
৪৭	১৮	প্রকতাশি	প্রকাশিত
৫৪	২৩	আমার	আরাম-
৫৮	২৬	দুঃদুঃ	দুঃখ
৬১	১০	রাণী	বাণী
৬৫, ৭	১৫, ১১	যে	সে
৬৫	১৯	তারা	তার।
৭৩	১১	নির্বিমেষ	নির্বিশেষ
৭৩, ৮০	১৬, ১৭	জগতাং	জগত্যাং
৭৫	১৮	আমারে	আত্মারে
৭৫	২১	সত্যাপলব্ধি	সত্যোপলব্ধি
৭৫	২২	জ্যোতির্ময়	জ্যোতির্ময
৭৫	২৭	বিচিত্রে	বিচিত্রের
৮০	৯	সম্পক্তৌ	সম্পৃক্তৌ
৮২	১, ২	পুঞ্জীভূতা······ অকাশের মর্মমূলে	পুঞ্জীভূত······ আকাশের মর্মমূল
৮২	১৪	অছে	আছে
৮৬	২২, ২৩	কাছে····· সেটুকু তোমার কাছে	আছে····· যেটুকু তোমার আছে
৮৭	১০	মরছে····· মরছে	সরছে······ সরছে